স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

বেদান্তের আলোকে

স্বামী বিবেকানন্দ

BENGALIEBOOK.COM
2021

সূচিপত্র

১. বেদান্ত দর্শন-প্রসঙ্গে 2

২. সভ্যতার অন্যতম শক্তি বেদান্ত 9

৩. বেদান্ত -দর্শনের তাৎপর্য ও প্রভাব 1 3

৪. বেদান্ত ও অধিকার 1 9

৫. অধিকার 3 4

৬. হিন্দু দার্শনিক চিন্তার বিভিন্ন স্তর 4 1

৭. হিন্দু দার্শনিক চিন্তার বিভিন্ন স্তর 5 5

৮. বৌদ্ধধর্ম ও বেদান্ত 6 9

৯. বেদান্তদর্শন এবং খ্রীষ্টধর্ম 7 2

১০. বেদান্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম? 7 5

১. বেদান্ত দর্শন-প্রসঙ্গে

বেদান্তবাদী বলেন যে, মানুষ জন্মায় না বা মরে না বা স্বর্গেও যায় না এবং আত্মার পক্ষে পুনর্জন্ম একটা নিছক কাহিনী মাত্র। দৃষ্টান্ত দিয়া বলা যায় যে, যেন একটি পুস্তকের পাতা উল্টানো হইতেছে; ফলে পুস্তকটির পাতার পর পাতা শেষ হইতেছে, কিন্তু পাঠকের উহাতে কিছুই হইতেছে না। প্রত্যেক আত্মা সর্বব্যাপী; সুতরাং উহা কোথায় যাইবে বা কোথা হইতে আসিবে? এই-সব জন্ম-মৃত্যুতে প্রকৃতিরই পরিবর্তন হয় এবং আমরা ভুলক্রমে উহাকে আমাদের পরিবর্তন বলিয়া মনে করি। পুনর্জন্ম প্রকৃতির অভিব্যক্তি এবং অন্তরে স্থিত ভগবানের বিকাশ।

বেদান্ত-মতে প্রত্যেক জীবন অতীতের উপর গঠিত এবং যখন আমরা আমাদের সমগ্র অতীতটাকে দেখিতে পাইব, তখনই আমরা মুক্ত হইব। মুক্ত হইবার ইচ্ছা শৈশবেই ধর্মপ্রবণতার রূপ লয়। সমগ্র সত্যটি মুমুক্ষুর নিকট পরিস্ফুট হইতে কয়েক বৎসর যেন লাগে। এই জন্ম পরিত্যাগ করিবার পর পরবর্তী জন্মের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। তখনও মানুষ মায়ার ভিতর থাকে।

আমরা আত্মাকে এইভাবে বর্ণনা করিঃ শস্ত্র উহাকে ছেদন করিতে পারে না, বর্শা বা কোন তীক্ষ্ণধার অস্ত্র উহাকে ভেদ করিতে পারে না, অগ্নি উহাকে দহন করিতে পারে না, জল উহাকে দ্রব করিতে পারে না; উহা অবিনাশী, সর্বব্যাপী; সুতরাং ইহার জন্য শোক করা উচিত নয়।

যদি আমাদের অবস্থা বর্তমানে খুব খারাপ হইয়া থাকে, তবে আমরা বিশ্বাস করি যে, অনাগত ভবিষ্যতে উহা ভাল হইবেই। সকলের জন্য শাশ্বত মুক্তি—ইহাই হইল আমাদের মূল নীতি। প্রত্যেককেই ইহা লাভ করিতে হইবে। মুক্তি ছাড়া অন্য সমস্ত বাসনাই ভ্রমপ্রসূত। বেদান্তী বলেন, প্রত্যেক সৎ কর্ম সেই মুক্তিরই প্রকাশ।

আমি বিশ্বাস করি না যে, এমন এক সময় আসিবে, যখন জগৎ হইতে সমস্ত অশুভ অন্তর্হিত হইবে। ইহা কি করিয়া হইতে পারে? এই প্রবাহ চলিতেছে। এক প্রান্ত দিয়া জল বাহির হইয়া যাইতেছে, আবার অন্য প্রান্ত দিয়া উহা পুনরায় প্রবেশ করিতেছে। বেদান্ত বলেন, তুমি শুদ্ধ ও পূর্ণ; এবং এমন একটি অবস্থা আছে, যাহা শুভ ও অশুভের ঊর্ধ্বে। উহাই হইল তোমার স্বরূপ। আমরা যাহাকে শুভ বলি, তাহা অপেক্ষাও উহা উচ্চতর। অশুভ হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন মাত্র। অশুভ (পাপ) বলিয়া আমাদের কোন তত্ত্ব নাই। আমরা ইহাকে 'অজ্ঞান' বলি।

আমাদের নীতিশাস্ত্র, আমাদের লোক-ব্যবহার—উহা যতদূর পর্যন্ত যাক না কেন, সবই মায়ার জগতের ভিতরে। সত্যের পরিপূর্ণ বিবৃতি হিসাবে অজ্ঞানাদি বিশেষণ ঈশ্বরে প্রয়োগ করিবার চিন্তাও আমরা করিতে পারি না। তাঁহার সম্বন্ধে আমরা শুধু বলি, তিনি সৎস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। চিন্তা ও বাক্যের প্রত্যেক প্রয়াস দ্রষ্টাকে দৃশ্যে পরিণত করিবে এবং উহার স্বরূপের হানি ঘটাইবে।

একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবেঃ আমি ব্রহ্ম—এই কথা ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে না। ইন্দ্রিয়-বিষয়ে যদি তুমি বল—আমিই ব্রহ্ম, তাহা হইলে অন্যায় কর্ম করিতে কে তোমাকে বাধা দিবে? সুতরাং তোমার ঈশ্বরত্ব শুধু মায়ার জগতের ঊর্ধ্বেই প্রযুক্ত হইতে পারে। যদি আমি যথার্থই ব্রহ্ম হই, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের আক্রমণের ঊর্ধ্বে আমি অবশ্যই থাকিব এবং কোন অসৎ কর্ম করিতে পারিব না। নৈতিকতা অবশ্য মানুষের লক্ষ্য নয়, কিন্তু মুক্তিপ্রাপ্তির ইহা একটি উপায়। বেদান্ত বলেন, যোগও একটি পথ, যে পথে মানুষ এই ব্রহ্মত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। বেদান্ত বলেন, অন্তরে যে মুক্তি আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই ব্রহ্মানুভূতি হয়। নৈতিকতা ও নীতিশাস্ত্র ঐ লক্ষ্যে পৌঁছিবার বিভিন্ন পথ মাত্র, ঐ-সবকে যথাযথ স্থানে বসাইতে হয়।

অদ্বৈত দর্শনের বিরুদ্ধে যত সমালোচনা হয় তাহার সারমর্ম হইল এই যে, অদ্বৈত বেদান্ত ইন্দ্রিয়ভোগে উৎসাহ দেয় না। আমরা আনন্দের সহিতই উহা স্বীকার করি। বেদান্তের আরম্ভ নিতান্ত দুঃখবাদে এবং শেষ হয় যথার্থ আশাবাদে। ইন্দ্রিয়জ আশাবাদ আমরা

অস্বীকার করি, কিন্তু অতীন্দ্রিয় আশাবাদ আমরা জোরের সহিত ঘোষণা করি। প্রকৃত সুখ ইন্দ্রিয়ভোগে নাই—উহা ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে এবং উহা প্রতি মানুষের ভিতরেই রহিয়াছে। জগতে আমরা যে আশাবাদের নিদর্শন দেখি, উহা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ধ্বংসের অভিমুখে লইয়া যাইতেছে। আমাদের দর্শনে ত্যাগকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ ত্যাগ বা নেতিভাব আত্মার যথার্থ অস্তিত্বই সূচিত করে। বেদান্ত ইন্দ্রিয়জগৎকে অস্বীকার করে—এই অর্থে বেদান্ত নৈরাশ্যবাদী, কিন্তু প্রকৃত জগতের কথা ঘোষণা করে বলিয়া আশাবাদী।

বেদান্ত মানুষের বিচারশক্তিকে যথেষ্ট স্বীকৃতি দেয়, যদিও ইহাতে বুদ্ধির অতীত আর একটি সত্তা রহিয়াছে, কিন্তু উহারও উপলব্ধির পথ বুদ্ধির ভিতর দিয়া। সমস্ত পুরাতন কুসংস্কার দূর করিবার জন্য যুক্তি একান্ত প্রয়োজন। তারপর যাহা থাকিবে, তাহাই বেদান্ত। একটি সুন্দর সংস্কৃত কবিতা আছে, যেখানে ঋষি নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'হে সখা, কেন তুমি ক্রন্দন করিতেছ? তোমার জন্ম-মরণ-ভীতি নাই। তুমি কেন কাঁদিতেছ? তোমার কোন দুঃখ নাই, কারণ তুমি অসীম নীল আকাশ-সদৃশ, অবিকারী তোমার স্বভাব। আকাশের উপর নানা বর্ণের মেঘ আসে, মুহূর্তের জন্য খেলা করিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু আকাশ সেই একই থাকে। তোমাকে কেবল মেঘগুলি সরাইয়া দিতে হইবে।' ১

আমাদের কেবল দ্বার খুলিয়া দিতে হইবে এবং পথ পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে। জল আপন বেগে ধাবিত হইবে এবং নিজের স্বভাবেই ক্ষেত্রটিকে আপ্লুত করিয়া ফেলিবে, কেন-না জল তো পূর্বেই সেখানে ছিল।

মানুষ অনেকটা চেতন, কিছুটা অচেতন আবার চেতনের ঊর্ধ্বে যাইবারও সম্ভাবনা তাহার আছে। কেবল আমরা যখন যথার্থ মানুষ হইতে পারিব, তখনই আমরা বিচারের উপরে উঠিতে পারিব। 'উচ্চতর' বা 'নিম্নতর' শব্দগুলি কেবল মায়ার জগতে ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু সত্যের জগতে উহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা নিতান্ত অসঙ্গত; কারণ সেখানে কোন ভেদ নাই। মায়ার জগতে মনুষ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ। বেদান্তী বলেন, মানুষ দেবতা অপেক্ষা

বড়। দেবতাদেরও মরিতে হইবে এবং পুনরায় মানবদেহ ধারণ করিতে হইবে। কেবলমাত্র নরদেহে তাহারা পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারে।

ইহা সত্য যে, আমরা একটা মতবাদ সৃষ্টি করিতেছি। আমরা স্বীকার করি যে, ইহা ত্রুটিহীন নয়, কারণ সত্য অবশ্যই সমস্ত মতবাদের উর্ধ্বে। কিন্তু অন্য মতবাদগুলির সহিত তুলনা করিলে আমরা দেখিব যে, বেদান্তই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত মতবাদ। তবুও ইহা সম্পূর্ণ নয়, কারণ যুক্তি ও বিচার সম্পূর্ণ নয়। ইহাই একমাত্র সম্ভাব্য যুক্তিসঙ্গত মতবাদ, যাহা মানব- মন ধারণা করিতে পারে।

ইহা অবশ্য সত্য যে, একটি মতবাদকে শক্তিশালী হইতে হইলে তাহাকে প্রচারশীল হইতে হইবে। বেদান্তের ন্যায় কোন মতবাদ এত প্রচারশীল হয় নাই। আজও পর্যন্ত ব্যক্তিগত সংস্পর্শ দ্বারাই যথার্থ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বহু অধ্যয়নের দ্বারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না। যাঁহারা যথার্থ মানুষ ছিলেন, তাঁহারা ব্যক্তিগত সংস্পর্শ দ্বারাই ঐরূপ হইতে পারিয়াছিলেন। ইহা সত্য যে, প্রকৃত মানুষের সংখ্যা খুবই অল্প, কিন্তু কালে তাঁহাদের সংখ্যা বাড়িবে। তথাপি তোমরা বিশ্বাস করিতে পার না যে, এমন একদিন আসিবে, যখন আমরা সকলেই দার্শনিক হইয়া যাইব। আমরা বিশ্বাস করি না যে, এমন এক সময় আসিবে, যখন একমাত্র সুখই থাকিবে এবং কোন দুঃখই থাকিবে না।

মধ্যে মধ্যে আমাদের জীবনে পরম আনন্দের মুহূর্ত আসে, যখন আনন্দ ছাড়া আমরা আর কিছুই চাই না, আর কিছুই দিই না বা জানি না। তারপর সেই ক্ষণটি চলিয়া যায় এবং আমাদের সম্মুখে জগৎপ্রপঞ্চ অবস্থিত দেখি। আমরা জানি, ঈশ্বরের উপর একটি পর্দা চাপান হইয়াছে মাত্র এবং ঈশ্বরই সমস্ত বস্তুর পটভূমিকারূপে অবস্থান করিতেছেন।

বেদান্ত শিক্ষা দেয় যে, নির্বাণ এই জীবনেই পাওয়া যাইতে পারে, উহা পাওয়ার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় না। আত্মানুভূতিই নির্বাণ এবং এক মুহূর্তের জন্যও উহা একবার সাক্ষাৎ করিলে আর কখনও কেহ ব্যক্তিত্বের মরীচিকায় মোহগ্রস্ত হয় না। আমাদের চক্ষু আছে সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আমরা অবশ্যই দেখিব, কিন্তু সর্বদা

আমরা জানিব, উহা কি। আমরা ইহার প্রকৃত স্বভাব জানিয়া ফেলিয়াছি। আবরণই আত্মাকে আচ্ছাদিত করে, আত্মা কিন্তু অপরিবর্তনীয়। আবরণ খুলিয়া যায় এবং আত্মাকে ইহার পশ্চাতে দেখিতে পাই। সব পরিবর্তনই এই আবরণে। মহাপুরুষে আবরণটি সূক্ষ্ম এবং আত্মা তাঁহার ভিতর দিয়া প্রায়ই প্রকাশিত হয়। পাপীতে আবরণটি ঘন, সেইজন্য তাহার আবরণের পশ্চাতে যে আত্মা রহিয়াছেন এবং মহাপুরুষের আবরণের পশ্চাতেও যে সেই একই আত্মা বিরাজ করিতেছেন—এই সত্যটি আমরা ভুলিয়া যাই। যখন আবরণটি নিঃশেষে অপসারিত হইবে, তখন আমরা দেখিব, উহা কখনই ছিল না এবং আমরা আত্মা ছাড়া আর কিছুই নই। আবরণের অস্তিত্বও আর আমাদের স্মরণে থাকিবে না।

জীবনে এই বৈশিষ্ট্যের দুইটি দিক্ আছে। প্রথমতঃ জাগতিক কোন বস্তু দ্বারা আত্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রভাবিত হন না। দ্বিতীয়তঃ একমাত্র তিনিই জগতের কল্যাণ করিতে সমর্থ হন। পরোপকার করার পশ্চাতে যে যথার্থ প্রেরণা, তাহা তিনিই উপলব্ধি করিয়াছেন, কারণ তাঁহার কাছে এক ছাড়া আর দ্বিতীয় নাই। ইহাকে অহঙ্কার বলা যায় না, কারণ উহা ভেদাত্মক। ইহাই একমাত্র নিঃস্বার্থপরতা। তাঁহার দৃষ্টি বিশ্বজনীন, ব্যক্তি-সর্বস্ব নয়। প্রেম ও সহানুভূতির প্রত্যেক ব্যাপার এই বিশ্বজনীনতার প্রকাশ—'নাহং, তুঁহু' তাঁহার এই ভাবটিকে দার্শনিক পরিভাষায় বলা যাইতে পারে, 'তুমি অপরকে সাহায্য কর, কারণ তুমি যে তাহাতে আছ এবং সেও যে তোমাতে আছে।' একমাত্র প্রকৃত বেদান্তীই তাঁহার ন্যায় মানুষকে সাহায্য করিতে পারিবেন ও বিনা দ্বিধায় তাঁহার জীবনদান করিবেন, কারণ তিনি জানেন যে, তাঁহার মৃত্যু নাই। জগতে যতক্ষণ একটিমাত্র পোকাও জীবিত থাকিবে, ততক্ষণ তিনিও জীবিত থাকিবেন, যতক্ষণ একটিমাত্র জীবও ভক্ষণ করিবে, ততক্ষণ তিনিও ভক্ষণ করিবেন। সুতরাং তিনি পরোপকার করিয়া যান; দেহকে সর্বাগ্রে রক্ষা করিতে হইবে—এই আধুনিক ধারণা তাঁহাকে কখনও বাধা দিতে পারিবে না। যখন মানুষ ত্যাগের এই শীর্ষে উপনীত হন, তখন তিনি নৈতিক দ্বন্দ্ব প্রভৃতি সব কিছুর উপরে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তিনি পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, গরু, কুকুর ও অতিশয় দূষিত স্থানকে আর ব্রাহ্মণ, গরু,

কুকুর ও দূষিত স্থানরূপে দেখেন না, কিন্তু দেখেন সেই একই ব্রহ্ম স্বয়ং সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন।২

এইরূপ সমদর্শী পুরুষই সুখী এবং তিনিই ইহজীবনে সংসার জয় করিয়াছেন অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর পারে গিয়াছেন।'৩ ঈশ্বর দ্বন্দ্বাদি-বর্জিত; সুতরাং বলা হয় যে, সমদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির ঈশ্বরলাভ হইয়াছে, তিনি ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিয়াছেন।

যীশু বলেন, 'আব্রাহামের পূর্বেও আমি ছিলাম।' ইহার অর্থ এই যে, যীশু এবং তাঁহার মত অবতার পুরুষেরা মুক্ত আত্মা। নাজারেথের যীশু তাঁহার প্রারব্ধের বশবর্তী হইয়া মানব-রূপ ধারণ করেন নাই, করিয়াছিলেন মানব-কল্যাণের জন্যই। ইহা ভাবা উচিত নয় যে, মানুষ যখন মুক্ত হয়, তখন সে কর্ম করিতে পারে না—একটা জড় মৃৎপিণ্ডে পরিণত হয়। পরন্তু সেই মানুষ অপরের অপেক্ষা অধিকতর উদ্যমী হন, কারণ অপরে বাধ্য হইয়া কর্ম করে, আর তিনি স্বাধীনভাবে কর্ম করেন।

যদি আমরা ঈশ্বর হইতে অভিন্ন হই, তাহা হইলে কি আমাদের কোন স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না? হাঁ, নিশ্চয়ই থাকিবে। ঈশ্বরই আমাদের স্বকীয়তা। এখন যে তোমার স্বাতন্ত্র্য আছে, উহা অবশ্য সেরূপ নয়। তুমি উহার দিকে অগ্রসর হইতেছ। স্বকীয়তার অর্থ এই যে, উহা এক অবিভাজ্য বস্তু। বর্তমান স্বাতন্ত্র্যকে কি করিয়া তুমি স্বকীয়তা বল? এখন তুমি একরকম চিন্তা করিতেছ, এক ঘণ্টা পরে আবার আর একরকম এবং দুই ঘণ্টা পরে আবার অন্যরকম চিন্তা করিবে। স্বকীয়তার পরিবর্তন নাই। উহা সর্ব বস্তুর উপরে—অপরিবর্তনীয়। আমরা বর্তমানে যে অবস্থায় আছি, ঐ অবস্থায় চিরকাল থাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ তাহা হইলে তস্কর তস্করই থাকিয়া যাইবে, বদমাশ বদমাশই থাকিবে, অন্য কিছু হইতে পারিবে না। প্রকৃত স্বকীয়তার কোনই পরিবর্তন হয় না এবং কোন কালে হইবেও না এবং উহাই ঈশ্বর, যিনি আমাদের ভিতর নিত্য বিরাজমান।

বেদান্ত এক বিশাল পারাবার-বিশেষ, যাহার উপরে একটি যুদ্ধজাহাজ ও একটি ভেলার পাশাপাশি স্থান হইতে পারে। এই বেদান্ত-মহাসাগরে একজন প্রকৃত যোগী—একজন

পৌত্তলিক বা এমন কি একজন নাস্তিকের সহিতও সহাবস্থান করিতে পারেন। শুধু তাহাই নয় বেদান্ত-মহাসাগরে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পারসী সব এক–সকলেই সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সন্তান।

২. সভ্যতার অন্যতম শক্তি বেদান্ত

[ইংলণ্ডের অন্তর্গত রিজওয়ে গার্ডেনস-এ অবস্থিত এয়ার্লি লজে প্রদত্ত বক্তৃতার অংশবিশেষ]

যাঁহাদের দৃষ্টি শুধু বস্তুর স্থূল বহিরঙ্গে আবদ্ধ, তাঁহারা ভারতীয় জাতির মধ্যে দেখিতে পান—কেবল একটি বিজিত ও নির্যাতিত জনসমাজ, কেবল এক দার্শনিক ও স্বপ্নবিলাসী মানব-গোষ্ঠী। ভারতবর্ষ যে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে জগজ্জয়ী, মনে হয়—তাঁহারা ইহা অনুভব করিতে অক্ষম। অবশ্য এ-কথা সত্য যে, যেমন অতিমাত্র কর্মচঞ্চল পাশ্চাত্য জাতি প্রাচ্যের অন্তর্মুখীনতা ও ধ্যানমগ্নতার সাহায্যে লাভবান্ হইতে পারে, সেইরূপ প্রাচ্যজাতিও অধিকতর কর্মোদ্যম ও শক্তি-অর্জনের দ্বারা লাভবান্ হইতে পারে। তাহা সত্ত্বেও এ প্রশ্ন অনিবার্য যে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতি একে একে অবক্ষয়ের সম্মুখীন হইলেও কোন্ শক্তিবলে নিপীড়িত এবং নির্যাতিত হিন্দু ও য়াহুদী জাতিই (যে দুইটি জাতি হইতে পৃথিবীর সব ধর্মমতের সৃষ্টি হইয়াছে) আজও বাঁচিয়া আছে? একমাত্র তাহাদের অধ্যাত্ম-শক্তিই ইহার কারণ হইতে পারে। নীরব হইলেও হিন্দুজাতি আজও বাঁচিয়া আছে, আর প্যালেষ্টাইনে বাসকালে য়াহুদীদের যে সংখ্যা ছিল, বর্তমানে তাহা বাড়িয়াছে। বস্তুতঃ ভারতের দর্শনচিন্তা সমগ্র সভ্যজগতের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া তাহার রূপান্তর সাধন করিয়া চলিয়াছে এবং তাহাতে অনুস্যূত হইয়া আছে। পুরাকালে যখন ইওরোপখণ্ডের অস্তিত্ব অজ্ঞাত ছিল, তখনও ভারতের বাণিজ্য সুদূর আফ্রিকার উপকূলে উপনীত হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য অংশের সহিত ভারতের যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল; ফলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয়েরা কখনও তাহাদের দেশের বাহিরে পদার্পণ করে নাই—এ বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নাই।

ইহাও লক্ষণীয় যে, ভারতে কোন বৈদেশিক শক্তির আধিপত্য-বিস্তার যেন সেই বিজয়ী শক্তির ইতিহাসে এক মাহেন্দ্রক্ষণ; কারণ সেই সন্ধিক্ষণেই তাহার লাভ হইয়াছে—ঐশ্বর্য, অভ্যুদয়, রাজ্যবিস্তার এবং অধ্যাত্ম-সম্পদ্। পাশ্চাত্য দেশের লোক সর্বদা ইহাই নির্ণয়

করিতে সচেষ্ট যে, এ জগতে কত বেশী বস্তু সে আয়ত্ত করিয়া ভোগ করিতে পারিবে। প্রাচ্যদেশের লোক তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়া চলে ও প্রমাণ করিতে চায় যে, কত অল্প ঐহিক সম্পদের দ্বারা তাহার দিন চলিতে পারে। বেদে আমরা এই সুপ্রাচীন জাতির ঈশ্বর-অনুসন্ধানের প্রয়াস দেখিতে পাই। ঈশ্বরের অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়া তাঁহারা ধর্মের বিভিন্ন স্তরে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্বপুরুষদের উপাসনা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে অগ্নি অর্থাৎ অগ্নির অধিষ্ঠাতা দেবতা, ইন্দ্র অর্থাৎ বজ্রের অধিষ্ঠাতা দেবতা, এবং বরুণ অর্থাৎ দেবগণের দেবতার উপাসনায় উপনীত হইয়াছিলেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে এই ধারণার ক্রমবিকাশ—এই বহু দেবতা হইতে এক পরম দেবতার ধারণায় উপনীত হওয়া আমরা সকল ধর্মমতেই দেখিতে পাই। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, যিনি বিশ্বের সৃষ্টি ও পরিপালন করিতেছেন, এবং যিনি সকলের অন্তর্যামী, তিনিই সকল উপজাতীয় দেবতার অধিনায়ক। ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা ক্রমবিকাশের পথে চলিয়া বহুদেবতাবাদ হইতে একেশ্বরবাদে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরকে এই প্রকার মানবীয় রূপগুণে বিভূষিত ভাবিয়া হিন্দুমন পরিতৃপ্ত হয় নাই, কারণ যাঁহারা ঈশ্বরানুসন্ধানে ব্যাপৃত, তাঁহাদের নিকট এই মত অত্যন্ত মানবীয় ভাবে পূর্ণ।

সুতরাং অবশেষে তাঁহারা এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগৎ ও জড়বস্তুর মধ্যে ঈশ্বরানুসন্ধানের প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্জগতে তাঁহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। অন্তর্জগৎ বলিয়া কিছু আছে কি? যদি থাকে, তাহা হইলে তাহার স্বরূপ কি? ইহা স্বরূপতঃ আত্মা, ইহা তাঁহাদের নিজ সত্তার সহিত অভিন্ন এবং একমাত্র এই বস্তু সম্বন্ধেই মানুষ নিশ্চিত হইতে পারে। আগে নিজেকে জানিতে পারিলেই মানুষ নিজেকে জানিতে পারে, অন্যথা নয়। এই একই প্রশ্ন সৃষ্টির আদিকালে ঋগ্বেদে ভিন্নভাবে করা হইয়াছিল—'সৃষ্টির আদি হইতে কে বা কোন্ তত্ত্ব বর্তমান?' এই প্রশ্নের সমাধান ক্রমে বেদান্তদর্শনের দ্বারা সম্পন্ন হয়। বেদান্তদর্শন বলে, আত্মা আছেন অর্থাৎ যাহাকে আমরা পরমতত্ত্ব, সর্বাত্মা বা স্ব-স্বরূপ বলিয়া অভিহিত করি, তাহা হইল সেই শক্তি, যাহা দ্বারা আদিকাল হইতে সব কিছু প্রকাশমান হইয়াছে, এখনও হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে।

বৈদান্তিক একদিকে যেমন প্রশ্নের ঐ সমাধান করিলেন, তেমনি আবার নীতিশাস্ত্রের ভিত্তিও আবিষ্কার করিয়া দিলেন। যদিও সকল প্রকার ধর্মসম্প্রদায়ই 'হত্যা করিও না, অনিষ্ট করিও না, প্রতিবেশীকে আপনার ন্যায় ভালবাস' ইত্যাদি নীতিবাক্য শিক্ষা দিয়াছেন, তথাপি কেহই তাহাদের কারণ নির্দেশ করেন নাই। 'কেন আমি আমার প্রতিবেশীর ক্ষতিসাধন করিব না?'—এই প্রশ্নের সন্তোষজনক বা সংশয়াতীত কোন উত্তরই ততক্ষণ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত হিন্দুরা শুধু মতবাদ লইয়া তৃপ্ত না থাকিয়া আধ্যাত্মিক গবেষণা-সহায়ে ইহার মীমাংসা করিয়া দিলেন। হিন্দু বলেনঃ আত্মা নির্বিশেষ ও সর্বব্যাপী, এবং সেইজন্য অনন্ত। অনন্ত বস্তু কখনও দুইটি হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে এক অনন্তের দ্বারা অপর অনন্ত সীমাবদ্ধ হইবে। জীবাত্মা সেই অনন্ত সর্বব্যাপী পরমাত্মার অংশবিশেষ, অতএব প্রতিবেশীকে আঘাত করিলে প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই আঘাত করা হইবে। এই স্থূল আধ্যাত্মিক তত্ত্বটিই সর্বপ্রকার নীতিবাক্যের মূলে নিহিত আছে। অনেক সময়ই বিশ্বাস করা হয় যে, পূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রগতির কালে মানুষ ভ্রম হইতে সত্যে উপনীত হয় এবং এক ধারণা হইতে অপর ধারণায় উপনীত হইতে হইলে পূর্বেরটি বর্জন করিতে হয়। কিন্তু ভ্রান্তি কখনও সত্যে লইয়া যাইতে পারে না। আত্মা যখন বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে, তখন সে এক সত্য হইতে অপর সত্যে উপনীত হয়, এবং তাহার পক্ষে প্রত্যেক স্তরই সত্য। আত্মা ক্রমে নিম্নতর সত্য হইতে ঊর্ধ্বতর সত্যে উপনীত হয়। বিষয়টি এইভাবে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে পারা যায়। এক ব্যক্তি সূর্যের অভিমুখে যাত্রা করিল এবং প্রতি পদে সে আলোকচিত্র গ্রহণ করিতে লাগিল। প্রথম চিত্রটি দ্বিতীয় চিত্র হইতে কতই না পৃথক্ হইবে, এবং তৃতীয়টি হইতে কিংবা সূর্যে উপনীত হইলে সর্বশেষটি হইতে উহা আরও কত পৃথক্ হইবে! এই চিত্রগুলি পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন হইলেও প্রত্যেকটিই সত্য; বিশেষ শুধু এইটুকু যে, দেশকালের পরিবেশ পরিবর্তিত হওয়ায় তাহারা বিভিন্নরূপে প্রতীত হইতেছে। এই সত্যের স্বীকৃতির ফলেই হিন্দুগণ সর্বনিম্ন হইতে সর্বোচ্চ ধর্মের মধ্যে নিহিত সর্বসাধারণ সত্যকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং এইজন্যই সকল জাতির মধ্যে একমাত্র হিন্দুগণই ধর্মের নামে কাহারও উপর অত্যাচার করে নাই। কোন মুসলমান সাধকের

স্মৃতিসৌধের কথা মুসলমানরা বিস্মৃত হইলেও হিন্দুদের দ্বারা তাহা পূজিত হয়। হিন্দুগণের এইরূপ পরধর্মসহিষ্ণুতার বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রাচ্য মন যতক্ষণ পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির বাঞ্ছিত লক্ষ্য—ঐক্য না পায়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনমতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক একমাত্র অণু বা পরমাণুর মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করেন। যখন তিনি উহা প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহার আর কোন কিছু আবিষ্কার করিবার থাকে না। আর আমরা যখন আত্মার বা স্ব-স্বরূপের ঐক্য দর্শন করি, তখন আর অধিক অগ্রসর হইতে পারি না। আমাদের নিকট তখন ইহা স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে, সেই একমাত্র সত্তাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের যাবতীয় বস্তুরূপে প্রতীত হইতেছে। অণুর নিজস্ব দৈর্ঘ্য বা বিস্তৃতি না থাকিলেও অণুগুলির মিশ্রণের ফলে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বিস্তৃতির উদ্ভব হয়—এইপ্রকার কথা স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিকদিগকে বাধ্য হইয়া অধ্যাত্মশাস্ত্রের সত্যতাও স্বীকার করিতে হয়। যখনই এক অণু অপর অণুর উপর ক্রিয়া করে, তখনই একটি যোগসূত্রের প্রয়োজন হয়। এই যোগসূত্রটি কিরূপ? যদি ইহা একটি তৃতীয় অণু হয়, তাহা হইলে সেই পূর্বের প্রশ্নটি অমীমাংসিতই থাকিয়া যায়, কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় অণু কিরূপে তৃতীয় অণুর উপর কার্য করিবে? এইরূপ যুক্তি যে অনবস্থাদোষদুষ্ট, তাহা অতি সুস্পষ্ট। সকল প্রকার পদার্থবিদ্যা এই এক আপাতসত্য মতবাদের উপর নির্ভর করিতেছে যে, বিন্দুর নিজের কোন পরিমাণ নাই, আর বিন্দুর মিলনে গঠিত রেখার দৈর্ঘ্য আছে অথচ প্রস্থ নাই—এই স্বীকৃতিতেও পরস্পর-বিরোধ থাকিয়া যায়। এইগুলি দেখা যায় না, ধারণাও করা যায় না। কেন? কারণ এইগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নয়, অধ্যাত্ম বা তাত্ত্বিক ধারণা মাত্র। সুতরাং পরিশেষে দেখা যায়, মনই সকল অনুভবের আকার দান করে। আমি যখন কোন চেয়ার দেখি, তখন আমি আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বাহিরে অবস্থিত বাস্তব চেয়ারটি দেখি না, বহিঃস্থ বস্তু এবং তাহার মানস প্রতিচ্ছায়া—এই উভয়ই দেখি; অতএব শেষ পর্যন্ত জড়বাদীও ইন্দ্রিয়াতীত অধ্যাত্মতত্ত্বে উপনীত হন।

৩. বেদান্ত -দর্শনের তাৎপর্য ও প্রভাব

[বোষ্টনের টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ক্লাবে প্রদত্ত ভাষণ]

আজ যখন সুযোগ পাইয়াছি, তখন এই অপরাহ্নের আলোচ্য বিষয় আরম্ভ করার পূর্বে একটু ধন্যবাদ প্রকাশের অনুমতি নিশ্চয় পাইব। আমি আপনাদের মধ্যে তিন বৎসর বাস করিয়াছি এবং আমেরিকার প্রায় সর্বত্রই ভ্রমণ করিয়াছি। এখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে এই সুযোগে এথেন্স নগরী-সদৃশ আমেরিকার এই শহরে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া যাওয়া খুবই সঙ্গত। এদেশে প্রথম পদার্পণের অল্প কয়েক দিন পরেই মনে করিয়াছিলাম, এই জাতি-সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে পারিব। কিন্তু আজ তিন বৎসর অতিবাহিত করার পরও দেখিতেছি যে, এ-সম্বন্ধে একখানি পৃষ্ঠা পূর্ণ করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পৃথিবীর বহু বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করিয়া আমি দেখিতেছি, বেশভূষা, আহার-বিহার বা আচার ব্যবহারের খুঁটিনাটি সম্পর্কে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, মানুষ—পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ; সেই একই আশ্চর্য মানব-প্রকৃতি সর্বত্র বিরাজিত। তথাপি প্রত্যেকেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কিছু আছে এবং এদেশীয়গণ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার সার আমি এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। এই আমেরিকা মহাদেশে কেহ কোন ব্যক্তিগত বিচিত্র ব্যবহারাদি সম্বন্ধে সমালোচনা করে না। মানুষকে তাহারা নিছক মানুষরূপেই দেখে এবং মানুষরূপেই হৃদয় দিয়া বরণ করে। এই গুণটি আমি পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখি নাই।

আমি এদেশে একটি ভারতীয় দর্শনমতের প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছিলাম; তাহা বেদান্ত-দর্শন নামে পরিচিত। এই দর্শন অতি প্রাচীন। ইহা বেদ নামে খ্যাত প্রাচীন সুবিশাল আর্য-সাহিত্য হইতে উদ্ভূত। বহু শতাব্দী ধরিয়া সংগৃহীত এবং সঙ্কলিত সেই বিশাল সাহিত্যে যে-সব উপলব্ধি, তত্ত্বালোচনা, বিশ্লেষণ এবং অনুধ্যান সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, ইহা যেন তাহা হইতেই প্রস্ফুটিত একটি সুকোমল পুষ্প। এই বেদান্ত-দর্শনের কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। প্রথমতঃ ইহা সম্পূর্ণরূপে নৈর্ব্যক্তিক, ইহার উদ্ভবের জন্য ইহা কোন ব্যক্তি বা ধর্মগুরুর নিকট ঋণী নয়; ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে নাই। অথচ যে-সব

ধর্মমত ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে, তাহাদের বিরুদ্ধে ইহার কোন বিদ্বেষ নাই। পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া বহু দর্শনমত ও ধর্মতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে—যথা বৌদ্ধধর্ম কিংবা আধুনিক কালের কয়েকটি ধর্মমত। খ্রীষ্ট ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীদেরই মত এই-সকল ধর্মসম্প্রদায়েরও প্রত্যেকটির একজন ধর্মনেতা আছেন এবং তাঁহারা তাঁহার সম্পূর্ণ অনুগত। কিন্তু বেদান্ত-দর্শনের স্থান যাবতীয় ধর্মমতের পটভূমিকায়। বেদান্তের সহিত পৃথিবীর কোন ধর্ম বা দর্শনের বিবাদ-বিসংবাদ নাই।

বেদান্ত একটি মৌলিক তত্ত্ব উপস্থাপিত করিয়াছে এবং বেদান্ত দাবী করে যে, উহা পৃথিবীর সব ধর্মমতের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। এই তত্ত্বটি হইল এই যে, মানুষ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন; আমরা আমাদের চতুষ্পার্শে যাহা কিছু দেখিতেছি, সকলই সেই ঐশী চেতনা হইতে প্রসূত। মানব-প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু বীর্যবান্, যাহা কিছু মঙ্গলময় এবং যাহা কিছু ঐশ্বর্যবান্, সে-সবই ঐ ব্রহ্মসত্তা হইতে উদ্ভূত; এবং যদিও তাহা অনেকের মধ্যেই সুপ্তভাবে বিরাজমান, তথাপি প্রকৃতপক্ষে মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ নাই, কারণ সকলেই সমভাবে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। যেন এক অনন্ত মহাসমুদ্র পশ্চাতে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং আমি ও আপনারা সকলে সেই অনন্ত মহাসমুদ্র হইতে একটি তরঙ্গরূপে উত্থিত হইয়াছি। আমরা প্রত্যেকেই সেই অনন্তকে বাহিরে প্রকাশ করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছি। সুতরাং সুপ্ত সম্ভাবনার দিক্ হইতে দেখিতে গেলে যে সৎ-চিৎ-ও আনন্দময় মহাসাগরের সহিত আমরা স্বভাবতঃ অভিন্ন, সেই মহাসাগরে আমাদের প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার রহিয়াছে। আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা সেই ঐশী সম্ভাবনাকে প্রকাশ করিবার তারতম্যের দরুন ঘটিয়াছে। অতএব বেদান্তের অভিমত এই যে, প্রত্যেক মানুষ যতটুকু ব্রহ্মশক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই দিক্ হইতে বিচার না করিয়া তাহার স্বরূপের দিক্ হইতেই তাহাকে বিচার করিতে হইবে। সকল মানুষই স্বরূপত ব্রহ্ম; অতএব কোন আচার্য যখন কাহাকেও সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন, তখন নিন্দাবাদ ছাড়িয়া দিয়া ঐ ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ব্রহ্মশক্তিকে জাগাইবার জন্যই তাঁহাকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

বেদান্ত ইহাও প্রচার করে যে, সমাজ-জীবনে ও প্রতি কর্মক্ষেত্রে আমরা যে বিশাল শক্তিপুঞ্জের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই, তাহা প্রকৃতপক্ষে অন্তর হইতে বাহিরে উৎসারিত হয়। অতএব অন্য ধর্মসম্প্রদায় যাহাকে অনুপ্রেরণা বা ঐশী শক্তির অন্তঃপ্রবেশ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, বেদান্তবাদী তাহাকেই মানবের ঐশী শক্তির বহির্বিকাশ নামে অভিহিত করিতে চান; অথচ তিনি অপর ধর্মসম্প্রদায়ের সহিত বিবাদ করিতে চান না। যাঁহারা মানুষের এই ব্রহ্মত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাঁহাদের সহিত বেদান্তবাদীর কোন বিরোধ নাই। কারণ জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, প্রত্যেক ব্যক্তি সেই ব্রহ্মশক্তিরই উন্মেষে যত্নপর।

মানুষ যেন ক্ষুদ্র আধারে আবদ্ধ, অথচ সতত প্রসারশীল একটি অনন্ত শক্তিমান্ স্প্রীং-এর মত; পরিদৃশ্যমান সমগ্র সামাজিক ঘটনা-পরম্পরা এই মুক্তি-প্রয়াসেরই ফল। আমাদের আশেপাশে যত কিছু প্রতিযোগিতা, হানাহানি এবং অশুভ দেখিতে পাই, তাহার কোনটাই এই মুক্তি প্রয়াসের কারণ বা পরিণাম নয়। আমাদের একজন প্রখ্যাত দার্শনিকের দৃষ্টান্ত অনুসারে ধরা যাক, কৃষিক্ষেত্রে জলসেচনের নিমিত্ত উচ্চস্থানে কোথাও পরিপূর্ণ জলাশয় অবস্থান করিতেছে; জলপ্রবাহ কৃষিক্ষেত্র অভিমুখে ছুটিতে চায়, কিন্তু একটি রুদ্ধ দ্বারের দ্বারা প্রতিহত হয়। দ্বারটি যেই উদ্ঘাটিত হইবে, অমনি জলরাশি নিজবেগে প্রবাহিত হইবে। পথে আবর্জনা বা মলিনতা থাকিলে প্রবহমান জলধারা তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু এই-সকল আবর্জনা ও মলিনতা মানবের এই দেবত্ব-বিকাশের পরিণামও নয়, কারণও নয়। ঐগুলি আনুষঙ্গিক অবস্থা মাত্র। অতএব ঐগুলির প্রতিকার সম্ভব।

বেদান্তের দাবী এই যে, এই চিন্তাধারা ভারতের ও বাহিরের সকল ধর্মমতের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়; তবে কোথাও উহা পুরাণের রূপক-কাহিনীর আকারে প্রকাশিত, আবার কোথাও প্রতীকের মাধ্যমে উপস্থাপিত। বেদান্তের দৃঢ় অভিমত এই যে, এমন কোন ধর্ম প্রেরণা এ-যাবৎ প্রকটিত হয় নাই কিংবা এমন কোন মহান্ দেবমানবের অভ্যুদয় হয় নাই, যাঁহাকে মানবপ্রকৃতির এই স্বতঃসিদ্ধ অসীম একত্বের অভিব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা

না চলে। নৈতিকতা, সততা ও পরোপকার বলিয়া যাহা কিছু আমাদের নিকট পরিচিত, তাহাও ঐ একত্বের প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। জীবনে এরূপ অনেক মুহূর্ত আসে, যখন প্রত্যেক মানুষই অনুভব করে যে, সে বিশ্বের সহিত এক ও অভিন্ন, এবং সে জ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানে হউক এই অনুভূতিই জীবনে প্রকাশ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। এই ঐক্যের প্রকাশকেই আমরা প্রেম ও করুণা নামে অভিহিত করিয়া থাকি এবং ইহাই আমাদের সমস্ত নীতিশাস্ত্র ও সততার মূলভিত্তি। বেদান্ত-দর্শনে ইহাকেই 'তত্ত্বমসি'—'তুমিই সেই'—এই মহাবাক্যে সূত্রাকারে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

প্রত্যেক মানুষকে বেদান্ত এই শিক্ষাই দেয়—সে এই বিশ্ব-সত্তার সহিত এক ও অভিন্ন; তাই যত আত্মা আছে, সব তোমারই আত্মা; যত জীবদেহ আছে, সব তোমারই দেহ; কাহাকেও আঘাত করার অর্থ নিজেকেই আঘাত করা এবং কাহাকেও ভালবাসার অর্থ নিজেকেই ভালবাসা। তোমার অন্তর হইতে ঘৃণারাশি বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অপর কাহাকেও তাহা আঘাত করুক না কেন, তোমাকেই আঘাত করিবে নিশ্চয়। আবার তোমার অন্তর হইতে প্রেম নির্গত হইলে প্রতিদানে তুমি প্রেমই পাইবে, কারণ আমিই বিশ্ব—সমগ্র বিশ্ব আমারই দেহ। আমি অসীম, তবে সম্প্রতি আমার সে অনুভূতি নাই। কিন্তু আমি সেই অসীমতার অনুভূতির জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং যখন আমাতে সেই অসীমতার পূর্ণ চেতনা জাগরিত হইবে, তখন আমার পূর্ণতা প্রাপ্তিও ঘটিবে। বেদান্তের অপর একটি বিশিষ্ট ভাব এই যে, ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে এই অসীম বৈচিত্র্যকে স্বীকার করিয়া চলিতে হইবে এবং সকলেরই লক্ষ্য এক বলিয়া সকলকেই একই মতে আনয়নের চেষ্টা ছাড়িয়া দিতে হইবে। বেদান্তবাদীর কবিত্বময় ভাষায় বলা যায়, 'যেমন বিভিন্ন স্রোতস্বতী বিভিন্ন পর্বত-শিখর হইতে উদ্গত হইয়া নিম্নভূমিতে অবতরণ করে এবং সরল বা বক্রগতিতে যথেচ্ছ প্রবাহিত হইয়া পরিশেষে সাগরে আসিয়া উপনীত হয়, তেমনি হে ভগবান্, এই-সকল বিভিন্ন বিচিত্র ধর্মবিশ্বাস ও পথ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে জন্মলাভ করিয়া সরল বা কুটিল পথে ধাবিত হইয়া অবশেষে তোমাতেই আসিয়া উপনীত হয়।'

বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই, এই অভিনব ভাবরাশির আধারভূত এই প্রাচীন দার্শনিক মতটি সর্বত্র নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া প্রত্যক্ষভাবে পৃথিবীর প্রথম প্রচারশীল ধর্মমত বৌদ্ধধর্মকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে এবং আলেকজান্দ্রিয়াবাসী, অজ্ঞেয়বাদী ও মধ্যযুগের ইওরোপীয় দার্শনিকের মাধ্যমে খ্রীষ্টধর্মকেও প্রভাবিত করিয়াছে। পরবর্তী কালে ইহা জার্মান-দেশীয় চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করিয়া দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক বিপ্লব ঘটাইয়াছে। অথচ এই অসীম প্রভাব প্রায় অলক্ষিতভাবেই পৃথিবীতে প্রসারিত হইয়াছে। রাত্রির মৃদু শিশিরসম্পাতে যেমন শস্যক্ষেত্রে প্রাণ সঞ্চারিত হয়, ঠিক তেমনি অতি ধীর গতিতে এবং অলক্ষ্যে এই অধ্যাত্মদর্শন মানবের কল্যাণার্থ সর্বত্র প্রসারিত হইয়াছে। এই ধর্মপ্রচারের জন্য সৈন্যগণের রণযাত্রার প্রয়োজন হয় নাই। পৃথিবীর অন্যতম প্রধান প্রচারশীল ধর্ম বৌদ্ধধর্মে আমরা দেখি, প্রথিতযশা সম্রাট্ অশোকের শিলালিপিসমূহ সাক্ষ্য দিতেছে, কিরূপে একদা বৌদ্ধধর্ম-প্রচারকেরা আলেকজান্দ্রিয়া, আণ্টিওক, পারস্য, চীন প্রভৃতি তদানীন্তন সভ্য জগতের বহু দেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ঐ শিলালিপিতে খ্রীষ্টের আবির্ভাবের তিনশত বৎসর পূর্বে তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা যেন অপর ধর্মকে নিন্দা না করেন। বলা হইয়াছিল, 'যেখানকারই হউক, সকল ধর্মেরই ভিত্তি এক; সকলকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে চেষ্টা কর, তোমার যাহা বলিবার আছে, সে-সকলই শিক্ষা দাও, কিন্তু এমন কিছু করিও না—যাহাতে কাহারও ক্ষতি হয়।'

এইরূপে দেখা যায়, ভারতবর্ষে হিন্দুদের দ্বারা অপর ধর্মাবলম্বীরা কখনও নির্যাতিত হয় নাই; প্রত্যুত এখানে দেখা যায় এক অত্যাশ্চর্য শ্রদ্ধা, যাহা তাহারা পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মমত সম্বন্ধে পোষণ করিয়াছে। নিজেদের দেশ হইতে বিতাড়িত য়াহুদীদের একাংশকে তাহারা আশ্রয় দিয়াছিল; তাহারই ফলে মালাবারে আজও য়াহুদীরা বর্তমান। অপর এক সময়ে তাহারা ধ্বংসপ্রায় পারসীক জাতির যে অংশটুকু সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল, আজও তাঁহারা আমাদের জাতির অংশরূপে, আমাদের একান্ত প্রিয়জনরূপে আধুনিক বোম্বাই-প্রদেশবাসী পারসীকগণের মধ্যে রহিয়াছেন। যীশুশিষ্য সেণ্ট টমাসের সহিত এদেশে আগমন করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন, এইরূপ খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরাও এদেশে আছেন;

তাঁহারা ভারতে বসবাস করিতে এবং নিজেদের ধর্মমত স্বাধীনভাবে পোষণ করিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন; তাঁহাদের একটি পল্লী আজও এদেশে বর্তমান। পরধর্মে বিদ্বেষহীনতার এই মনোভাব আজও ভারতে বিনষ্ট হয় নাই, কোন দিনই হইবে না এবং হইতেও পারে না।

বেদান্ত যে-সব মহতী বাণী প্রচার করে, সেগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। ইহাই যখন স্থির হইল যে, আমরা জানিয়া হউক বা না জানিয়াই হউক একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছি, তখন অপরের অক্ষমতায় ধৈর্যহারা হইব কেন? কেহ অপরের তুলনায় শ্লথগতি হইলেও আমাদের তো ধৈর্য হারাইয়া কোন লাভ হইবে না, তাহাকে আমাদের অভিশাপ দিবার অথবা নিন্দা করিবারও প্রয়োজন নাই। আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে, চিত্ত শুদ্ধ হইলে দেখিতে পাইব—সর্বকার্যে সেই একই ব্রহ্মশক্তির প্রভাব বিদ্যমান, সর্বমানব-হৃদয়ে সেই একই ব্রহ্মসত্তার বিকাশ ঘটিতেছে। শুধু সেই অবস্থাতেই আমরা বিশ্বভ্রাতৃত্বের দাবী করিতে পারিব।

মানুষ যখন তাহার বিকাশের উচ্চতম স্তরে উপনীত হয়, যখন নর-নারীর ভেদ, লিঙ্গভেদ, মতভেদ, বর্ণভেদ, জাতিভেদ প্রভৃতি কোন ভেদ তাহার নিকট প্রতিভাত হয় না, যখন সে এই-সকল ভেদবৈষম্যের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সর্বমানবের মিলনভূমি মহামানবতা বা একমাত্র ব্রহ্মসত্তার সাক্ষাৎকার লাভ করে, কেবল তখনই সে বিশ্বভ্রাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। একমাত্র ঐরূপ ব্যক্তিকেই প্রকৃত বৈদান্তিক বলা যাইতে পারে।

ইতিহাসে বেদান্ত-দর্শনের বাস্তবিক কার্যকারিতার যে-সকল সাক্ষ্য পাওয়া যায়, সেগুলির মধ্যে কয়েকটি মাত্র এখানে উল্লিখিত হইল।

৪. বেদান্ত ও অধিকার

[লণ্ডনে প্রদত্ত]

আমরা অদ্বৈত বেদান্তের তত্ত্বাংশ প্রায় শেষ করিয়াছি। একটা বিষয় এখনও বাকী আছে; বোধ হয় উহা সর্বাপেক্ষা দুরূহ। এ পর্যন্ত আমরা দেখিয়াছি, অদ্বৈত বেদান্ত অনুসারে আমাদের চারিদিকে দৃশ্যমান বস্তুনিচয়—সমগ্র জগৎই সেই এক সত্তা-স্বরূপের বিবর্তন। সংস্কৃতে এই সত্তাকে 'ব্রহ্ম' বলা হয়। ব্রহ্ম প্রপঞ্চে পরিবর্তিত হইয়াছেন। কিন্তু এখানে একটি অসুবিধাও আছে। ব্রহ্মের পক্ষে বিশ্বপ্রকৃতিতে রূপায়িত হওয়া কি করিয়া সম্ভব? কেনই বা ব্রহ্ম বিপরিণত হইলেন? সংজ্ঞা হইতেই বোঝা যায় ব্রহ্ম অপরিণামী। অপরিবর্তনীয় বস্তুর পরিবর্তন একটি স্ববিরোধী উক্তি। যাঁহারা সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাঁহাদের ঐ একই অসুবিধা। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করা যায়—কি প্রকারে এই সৃষ্টির উদ্ভব হইল? ইহা নিশ্চয়ই কোন সত্তাশূন্য পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় নাই; হইলে উহা স্ববিরোধী হইবে। সত্তাশূন্য কোন কিছু হইতে কোন বস্তু উৎপন্ন হওয়া কখনই সম্ভব নয়। কার্য কারণেরই অন্যতর রূপমাত্র। বীজ হইতে মহা মহীরুহ উৎপন্ন হয়। বৃক্ষটি বায়ু ও জল-সংযুক্ত বীজ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। বৃক্ষ-শরীর গঠনের নিমিত্ত যে পরিমাণ বায়ু ও জলের প্রয়োজন, তাহা নির্ধারণ করিবার যদি কোন উপায় থাকিত, তাহা হইলে আমরা দেখিতাম—কার্যরূপ বৃক্ষে যে পরিমাণ জল ও বায়ু আছে, উহার কারণরূপ জল ও বায়ুর পরিমাণও ঠিক তদ্রূপ। আধুনিক বিজ্ঞানও নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছে যে, কারণই অন্য আকারে কার্যে পরিণত হইতেছে। কারণের বিভিন্ন সমন্বিত অংশ পরিবর্তনের ভিতর দিয়া কার্যে পরিণত হয়। জগৎ কারণহীন—এইরূপ কষ্টকল্পনা আমাদের বর্জন করিতেই হইবে। সুতরাং আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে, ঈশ্বরই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন।

কিন্তু আমরা একটি সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অপর একটি সঙ্কটে পতিত হইলাম। প্রত্যেক মতবাদেই ঈশ্বরের ধারণার সহিত তাঁহার অপরিণামিত্বের ধারণা ওতপ্রোতভাবে জড়িত—একটির ভিতর দিয়াই অপরটি আসিয়া পড়ে। অত্যন্ত আদিম অস্পষ্ট

ঈশ্বরানুসন্ধান-ব্যাপারেও একটিমাত্র ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়–ইহা হইল মুক্তি। এই ধারণা কিভাবে আসিল, তাহার ঐতিহাসিক ক্রম-পরিণতি আমরা দেখিয়াছি। মুক্তি ও অপরিণামিত্ব একই কথা। যাহা মুক্ত, তাহাই অপরিণামী। যাহা অপরিণামী, তাহাই মুক্ত। কোন কিছুই ভিতরে কোনরূপ পরিবর্তন সম্ভবপর হইলে তাহার ভিতরে বা বাহিরে এমন কিছু থাকা চাই, যাহা ঐ বস্তুর পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা ঐ বস্তু অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। যাহা কিছু পরিবর্তনশীল, তাহা এইরূপ এক বা একাধিক কারণ দ্বারা বদ্ধ, যে কারণগুলি নিজেরাও ঐরূপ পরিবর্তনশীল। যদি মনে করা যায়–ঈশ্বরই জগৎ হইয়াছেন, তাহা হইলে ঈশ্বর এখানে তাঁহার স্বরূপ পরিবর্তন করিয়াছেন। আবার যদি মনে করি, অনন্ত ব্রহ্ম এই সান্ত জগৎ হইয়াছেন, তাহা হইলে ব্রহ্মের অসীমত্বও তদনুপাতে হ্রাস পাইল, সুতরাং তাঁহার অসীমত্ব হইতে এই জগৎ বাদ পড়িতেছে–এইরূপ বুঝিতে হইবে। পরিণামী ঈশ্বর ঈশ্বরই হইতে পারেন না। ঈশ্বরই জগৎ-রূপে পরিণত হন–এই মতবাদের দার্শনিক অসুবিধা পরিহার করিবার জন্য বেদান্তের একটি নির্ভীক মতবাদ আছে। তাহা এই যে, জগৎকে যেভাবে আমরা জানি বা উহার সম্বন্ধে যেভাবে আমরা চিন্তা করি, সেইভাবে উহার কোন অস্তিত্ব নাই। বেদান্ত বলেন, সেই অপরিণামীর কখনও পরিবর্তন হয় নাই, আর এই সমগ্র জগৎ একটি প্রাতিভাসিক সত্তা মাত্র, ইহার বাস্তব কোন সত্তা নাই। বেদান্ত বলেন, আমাদের এই যে অংশের ধারণা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর ধারণা এবং উহাদের পারস্পরিক পৃথকত্বের ধারণা, সে-সকলই বাহ্য–এগুলির কোন পারমার্থিক সত্তা নাই। ঈশ্বরের কোনই পরিবর্তন হয় নাই; তিনি জগৎ-রূপে কখনও পরিণত হন নাই। আমরা ঈশ্বরকে যে জগৎ-রূপে দেখিয়া থাকি, তাহার কারণ আমরা দেশ, কাল ও নিমিত্তের মধ্য দিয়া তাঁহাকে দেখি। এই দেশ, কাল ও নিমিত্তই এই আপাতপ্রতীয়মান পার্থক্য সৃষ্টি করে, কিন্তু উহা পারমার্থিক নয়। ইহা সত্যসত্যই একটি দ্ব্যর্থহীন নির্ভীক মতবাদ। এখন এই মতবাদটি আমাদের আরও একটু পরিষ্কারভাবে বুঝিতে হইবে। ভাববাদ (Idealism) সাধারণতঃ যে অর্থে গৃহীত হয়, ইহা সেইরূপ ভাববাদ নয়। ইহা বলে না যে, এই জগতের কোন অস্তিত্ব নাই; ইহা বলে যে, ইহার অস্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু ইহাকে আমরা যে ভাবে দেখিতেছি, ইহা ঠিক তাহা নয়। এই তত্ত্বটি বুঝাইবার জন্য

অদ্বৈত বেদান্ত একটি সুবিদিত উদাহরণ দেন। রাত্রির অন্ধকারে একটি গাছের গুঁড়িকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি ভূত বলিয়া মনে করে; দস্যু মনে করে, উহা পুলিস; বন্ধুর জন্য অপেক্ষমাণ ব্যক্তি মনে করে, উহা তাহারই বন্ধু। এই-সকল ব্যাপারে গাছের গুঁড়িটির কিন্তু কোনই পরিবর্তন হয় নাই, কতকগুলি আপাতপ্রতীয়মান পরিবর্তন অবশ্যই ঘটিয়াছিল এবং উহা ঘটিয়াছিল ভিন্ন ভিন্ন দর্শকেরই মনে। মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে নিজের অনুভূতির (Subjective) দিক্ হইতে ইহা আমরা আরও বেশী বুঝিতে পারি। আমাদের বাহিরে এমন একটা কিছু আছে, যাহার যথার্থ স্বরূপ আমাদের নিকট অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয়; ইহাকে বলা যাক 'ক'। আমাদের ভিতরেও আরও এমন একটা কিছু আছে, যাহা আমাদের নিকট অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয়; ইহাকে বলা যাক 'খ'। জ্ঞেয় বস্তু মাত্রই এই 'ক' এবং 'খ'-এর সমষ্টি; সুতরাং আমরা যে-সকল বস্তু জানি, সেগুলির প্রত্যেকটিরই দুইটি অংশ অবশ্যই থাকিবে—'ক' বহির্ভাগ এবং 'খ' অন্তর্ভাগ এবং 'ক' এবং 'খ'-এর সমষ্টিলব্ধ বস্তুকেই আমরা জানিতে সমর্থ হই। অতএব জগতের প্রত্যেক দৃশ্যমান বস্তু আংশিকভাবে আমাদের সৃষ্টি এবং উহার অপর অংশটি বাহ্য। এখন বেদান্ত বলেন, এই 'ক' এবং 'খ' এক অখণ্ড সত্তা।

হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক ও অন্য কয়েকজন আধুনিক দার্শনিকও ঠিক এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। যখন বলা হয়—যে-শক্তি পুষ্পের ভিতর আত্মপ্রকাশ করিতেছে, সেই শক্তিই আমার চেতনার মধ্যে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে—বৈদান্তিকও এই একই ভাব প্রচার করিতে ইচ্ছুক। তাঁহারা বলেন, বহির্জগতের সত্যতা এবং অন্তর্জগতের সত্যতা একই। এমন কি বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা, উহা আমাদেরই সৃষ্টি। আমরাই উহাদিগকে পরস্পর হইতে পৃথক্ করিয়াছি। বস্তুতঃ বাহ্যজগৎ বা অন্তর্জগতের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আমাদের যদি আর একটি ইন্দ্রিয় উদ্ভূত হয়, সমগ্র জগৎ আমাদিগের নিকট পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, আমাদের মনই আমাদের অনুভূত বিষয়কে পরিবর্তিত করে। আমি যদি পরিবর্তিত হই, তবে বাহ্যজগৎও পরিবর্তিত হইবে। সুতরাং বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে—তুমি, আমি এবং বিশ্বের

সর্ববস্তুই সেই নিরতিশয় ব্রহ্ম, আমরা ব্রহ্মের অংশবিশেষ নই, সমগ্রভাবেই আমরা ব্রহ্ম। তুমি সেই ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মের সবটুকুই; অন্যান্য সকলেও ঠিক তাই। কারণ এই অখণ্ড সত্তার অংশবিশেষের ধারণা হইতে পারে না। এই-সকল জাগতিক বিভাগ, এই-সকল সসীমত্ব প্রতীতি মাত্র, স্বরূপতঃ অসম্ভব। আমি স্বয়ংসম্পূর্ণ, সর্বাঙ্গসুন্দর; আমি কখনও বদ্ধ হই নাই। বেদান্ত নির্ভীকভাবে প্রচার করেনঃ তুমি যদি মনে কর—তুমি বদ্ধ, তাহা হইলে তুমি বদ্ধই থাকিয়া যাইবে; তুমি যদি বুঝিয়া থাক—তুমি মুক্ত, তবে তুমি মুক্তই থাকিবে। সুতরাং এই দর্শনের একমাত্র লক্ষ্য হইল আমাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া যে, আমরা সর্বদাই মুক্ত ছিলাম এবং চিরদিনই মুক্ত থাকিব। আমাদের কখনও কোন পরিবর্তন হয় না, আমাদের মৃত্যু নাই, আমরা কখনই জন্মগ্রহণ করি না। তাহা হইলে এই পরিবর্তনসমূহ কি? এই বাহ্যজগতের অবস্থা কি দাঁড়াইবে? এই জগৎ একটি প্রাতিভাসিক জগৎ মাত্র—ইহা দেশ, কাল ও নিমিত্ত দ্বারা বদ্ধ। বেদান্ত-দর্শনে ইহাকে 'বিবর্তবাদ' বলা হয়, প্রকৃতির এই ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়াই ব্রহ্ম প্রকাশিত হইতেছেন। ব্রহ্মের কোন পরিবর্তন নাই; তাঁহার কোন পরিণামও নাই। অতিক্ষুদ্র জীবকোষেও সেই অনন্ত পূর্ণব্রহ্মই অন্তর্নিহিত। বাহ্য আবরণের জন্যই ইহাকে 'জীবকোষ' বলা হয়; কিন্তু জীবকোষ হইতে মহামানব পর্যন্ত সকলের আভ্যন্তর সত্তার কোন পরিবর্তন নাই—ইহা এক ও অপরিবর্তনীয়; কেবল বাহিরের আবরণেরই পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে।

ধরা যাক—এখানে একটি পর্দা রহিয়াছে এবং ইহার বাহিরে রহিয়াছে সুন্দর দৃশ্য। পর্দার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে; ইহার ভিতর দিয়াই আমরা বাহিরের দৃশ্যটির খানিকটা দেখিতে পাইতেছি। মনে করুন—এই ছিদ্রটি বাড়িতে লাগিল; ইহা যতই বড় হইতে লাগিল, ততই দৃশ্যটি অধিকতরভাবে আমাদের দৃষ্টিপথে আসিতে লাগিল। পর্দাটি যখন তিরোহিত হইল, তখন আমরা সমগ্র দৃশ্যটির সম্মুখীন হইলাম। বাহিরের দৃশ্যটি হইল আত্মা; আমাদের ও দৃশ্যটির মধ্যে যে পর্দা, তাহা হইল মায়া—অর্থাৎ দেশ, কাল ও নিমিত্ত। উহার কোথাও একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, যাহার মধ্য দিয়া আমি আত্মাকে এক ঝলক মাত্র দেখিতে পাইতেছি। ছিদ্রটি বড় হইলে আমি আত্মাকে আরও পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাইব; আর যখন পর্দাটি একেবারে তিরোহিত হইয়া যাইবে, তখন অনুভব

করিব—আমিই আত্মস্বরূপ। সুতরাং জাগতিক পরিবর্তন নিরতিশয় ব্রহ্মে সাধিত হয় না—হয় প্রকৃতিতে। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্ম স্বরূপে প্রকাশিত না হন, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতিতে ক্রমবিবর্তন চলিতে থাকে। প্রত্যেকের মধ্যেই ব্রহ্ম রহিয়াছেন, কেবল কাহারও মধ্যে অন্যের তুলনায় তিনি অধিকতর প্রকাশিত। সমগ্র জগৎ পরমার্থতঃ এক। আত্মা-সম্বন্ধে বলিতে গিয়া এক আত্মা অন্য আত্মা অপেক্ষা বড়—এরূপ বলার কোন অর্থ হয় না। ইতর প্রাণী হইতে বা উদ্ভিদ অপেক্ষা মানুষ বড়, এ-কথা বলাও সেজন্য নিরর্থক। সমগ্র জগৎ এক। উদ্ভিদের মধ্যে তাহার আত্মপ্রকাশের বাধা খুব বেশী, ইতর প্রাণীর মধ্যে একটু কম; মানুষের মধ্যে আরও কম; সংস্কৃতিসম্পন্ন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিতে তদপেক্ষাও কম; কিন্তু পূর্ণতম ব্যক্তিতে আত্মপ্রকাশের বাধা একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। আমাদের সমস্ত সংগ্রাম, প্রচেষ্টা, সুখ-দুঃখ, হাসিকান্না, যাহা কিছু আমরা ভাবি বা করি—সবই সেই একই লক্ষ্যের দিকে—পর্দাটিকে ছিন্ন করা, ছিদ্রটিকে বৃহত্তর করা, অভিব্যক্তি ও অন্তরালে অবস্থিত সত্যের মধ্যবর্তী আবরণকে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিয়া তোলা। সুতরাং আমাদের কাজ আত্মার মুক্তিসাধন নয়, আমাদের নিজেদের বন্ধনমুক্ত করা। সূর্য মেঘস্তরের দ্বারা আবৃত, কিন্তু মেঘস্তর সূর্যের কোন পরিবর্তন সংঘটন করিতে পারে না। বায়ুর কাজ মেঘগুলিকে সরাইয়া দেওয়া; আর মেঘগুলি যত সরিয়া যাইবে, সূর্যালোক তত প্রকাশ পাইবে। আত্মাতে কোন পরিবর্তন নাই—ইহা অনন্ত, নিত্য, নিরতিশয় সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। আত্মার কোন জন্ম বা মৃত্যু হইতে পারে না। জন্ম, মৃত্যু, পুনর্জন্ম, স্বর্গগমন—এই-সব আত্মার ধর্ম নয়। এইগুলি বিভিন্ন আপাতপ্রতীয়মান অভিব্যক্তি মাত্র—মরীচিকা বা নানাবিধ স্বপ্ন। ধরা যাক, একজন ব্যক্তি জগৎসম্বন্ধে স্বপ্ন দেখিতেছে—সে এখন দুর্ভাবনা এবং দুষ্কর্মের স্বপ্নে মশগুল, কিছু সময় পরে সেই স্বপ্নেরই ভাবনা তাহার পরবর্তী স্বপ্ন সৃষ্টি করিবে। সে স্বপ্নে দেখিতে পাইবে যে, সে একটি ভয়ঙ্কর স্থানে রহিয়াছে এবং নির্যাতিত হইতেছে। যে ব্যক্তি শুভ ভাবনা ও শুভকর্মের স্বপ্ন দেখিতেছে, সে এই স্বপ্নের অবসানে আবার স্বপ্ন দেখিবে যে, সে আরও ভাল জায়গায় রহিয়াছে। এইভাবে স্বপ্নের পর স্বপ্ন আসিতে থাকে। কিন্তু এমন এক সময় আসিবে, যখন এই সমস্ত স্বপ্ন বিলীন হইয়া যাইবে। আমাদের প্রত্যেকের এমন এক সময় অবশ্যই আসিবে, যখন মনে

হইবে সমগ্র জগৎ স্বপ্নমাত্র ছিল; তখন আমরা দেখিতে পাইব—আত্মা তাহার এই পরিবেশ হইতে অনন্ত গুণে বড়। এই পরিবেশের ভিতর দিয়া সংগ্রাম করিতে করিতে এমন এক সময় আসিবে, যখন আমরা দেখিতে পাইব—অনন্তশক্তিসম্পন্ন আত্মার তুলনায় এই পরিবেশগুলির কোনই অর্থ নাই। অবশ্য এই প্রকার অনুভূতি কালসাপেক্ষ; আর অনন্তের তুলনায় এই কাল কিছুই নহে, ইহা সমুদ্রের মধ্যে বিন্দুতুল্য। সুতরাং শান্তভাবে আমরা অপেক্ষা করিতে পারি।

এইরূপে দেখিতে পাই, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমগ্র জগৎ সেই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। চন্দ্র অন্যান্য গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ-ক্ষেত্র হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে; একদিন না একদিন ইহা নিশ্চয়ই বাহির হইয়া আসিবে। কিন্তু যাঁহারা সজ্ঞানে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা শীঘ্রই কৃতকার্য হইবেন। কার্যতঃ এই বৈদান্তিক মতবাদের একটি সুবিধা এই যে, যথার্থ বিশ্বপ্রেমের ধারণা কেবল এই দৃষ্টিকোণ হইতেই সম্ভব। সকলেই আমাদের সহযাত্রী, সকলেই এক পথের পথিক—সকল জীবন, সকল তরু-গুল্ম, সকল প্রাণী—সকলেই সেই দিকে যাইতেছে; শুধু আমার মানুষ-ভ্রাতা নয়, জন্তু-জানোয়ার, তরু-গুল্ম, আমার সকল ভাই-ই সেই দিকে চলিয়াছে; কেবল আমার ভাল ভাইটি নয়, আমার খারাপ ভাইটিও, শুধু আমার ধার্মিক ভাইটি নয়, আমার দুর্বৃত্ত ভাইটিও—সকলেই একই লক্ষ্যে যাইতেছে। প্রত্যেকেই একই প্রবাহে ভাসমান, প্রত্যেকেই অনন্ত মুক্তির দিকে ছুটিতেছে। আমরা এই গতি বন্ধ করিতে পারি না; কেহই পারে না; হাজার চেষ্টা করিলেও কেহই ইহা হইতে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না, মানুষ সম্মুখে চালিত হইবেই এবং পরিণামে মুক্তিলাভ করিবেই। সৃষ্টির অর্থ মুক্তির অবস্থায় পুনর্বার ফিরিয়া যাইবার জন্য সংগ্রাম। মুক্তিই আমাদের সত্তার কেন্দ্রস্থল; ইহা হইতে আমরা যেন উৎক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা যে এখানে রহিয়াছি, ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, আমরা কেন্দ্রাভিমুখে অগ্রসর হইতেছি এবং এই কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণের অভিব্যক্তিকেই আমরা বলি ‘প্রেম’ ।

এইরূপ প্রশ্ন করা হয়—এই জগৎ কোথা হইতে আসিল? কোথায় ইহার স্থিতি? কোথায়ই বা ফিরিয়া যায়? উত্তর হইল—প্রেম হইতে ইহার উৎপত্তি, প্রেমই ইহার স্থিতি, প্রেমেই ইহার প্রত্যাবর্তন। এখন আমরা বুঝিতে পারি যে, কেহ পছন্দ করুক বা না করুক, কাহারও পক্ষে পশ্চাদপসরণ সম্ভব নহে। যতই পশ্চাদপসরণের চেষ্টা করা যাক না কেন, প্রত্যেককেই কেন্দ্রস্থলে উপনীত হইতে হইবে। তবুও আমরা যদি জ্ঞাতসারে—সজ্ঞানে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের গতিপথ মসৃণ হইবে, ঘাত-প্রতিঘাতের কর্কশত্ব অনেকটা মন্দীভূত হইবে এবং আমাদের লক্ষ্যপ্রাপ্তি ত্বরান্বিত হইবে। ইহা হইতে আমরা স্বভাবতঃ আর একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হই—সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত শক্তি আমাদের ভিতরে, বাহিরে নয়। যাহাকে আমরা প্রকৃতি বলি, তাহা একটি প্রতিবিম্বক কাঁচ মাত্র। আমাদের সমস্ত জ্ঞান আমাদের ভিতর হইতে আসিয়া প্রকৃতিরূপ এই কাঁচের উপরে প্রতিফলিত হয়। প্রকৃতির এইটুকু মাত্রই প্রয়োজন; যাহাকে আমরা শক্তি বলি, প্রাকৃতিক রহস্য বলি, বেগ বলি, সে সবই আমাদের ভিতরে। বাহ্যজগতে রহিয়াছে কেবল এক পরিবর্তনের পরম্পরা। প্রকৃতিতে কোন জ্ঞান নাই; আত্মা হইতেই সমস্ত জ্ঞান আসে। মানুষই আপনার মধ্যে জ্ঞানকে আবিষ্কার করে, উহাকে প্রকাশ করে। এই জ্ঞান অনন্তকাল ধরিয়া সেখানে রহিয়াছে। প্রত্যেকেই জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত আনন্দস্বরূপ এবং অনন্ত সত্তাস্বরূপ। অন্যত্র আমরা যেমন দেখিয়াছি, সাম্যের নৈতিক ফল যেরূপ, এই প্রকার বোধেরও ফল সেইরূপ।

বিশেষ সুবিধা ভোগ করিবার ধারণা মনুষ্যজীবনের কলঙ্কস্বরূপ। দুইটি শক্তি যেন নিয়ত ক্রিয়া করিতেছে; একটি বর্ণ ও জাতিভেদ সৃষ্টি করিতেছে এবং অপরটি উহা ভাঙিতেছে। অন্য ভাবে বলিতে গেলে একটি সুবিধার সৃষ্টি করিতেছে এবং অপরটি উহা ভাঙিতেছে। আর যতই ব্যক্তিগত সুবিধা ভাঙিয়া যায়, ততই সে সমাজে জ্ঞানের দীপ্তি ও প্রগতি আসিতে থাকে। এইরূপ সংগ্রাম আমরা আমাদের চতুর্দিকে দেখিতে পাই। অবশ্য প্রথমে আসে পাশব সুবিধার ধারণা—দুর্বলের উপর সবলের অধিকারের চেষ্টা। এই জগতে ধনের অধিকারও ঐরূপ। একটি লোকের অপরের তুলনায় যদি বেশী অর্থ হয়, তাহা হইলে যাহারা কম অর্থশালী, তাহাদের উপর সে একটু অধিকার স্থাপন বা সুবিধা ভোগ করিতে

চায়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদের অধিকার-লিপ্সা সূক্ষ্মতর এবং অধিকতর প্রভাবশালী। যেহেতু একটি লোক অন্যদের তুলনায় বেশী জানে শোনে, সেইজন্য সে অধিকতর সুবিধার দাবী করে। সর্বশেষ এবং সর্বনিকৃষ্ট অধিকার হইল আধ্যাত্মিক সুবিধার অধিকার। ইহা নিকৃষ্টতম, কেন-না ইহা সর্বাধিক পরপীড়ক। যাহারা মনে করে 'আধ্যাত্মিকতা বা ঈশ্বর সম্বন্ধে আমরা বেশী জানি', তাহারা অন্যের উপর অধিকতর অধিকার দাবী করে। তাহারা বলে, 'হে সাধারণ ব্যক্তিগণ, এস, আমাদের পূজা কর। আমরা ঈশ্বরের দূত; তোমাদের আমাদিগকে পূজা করিতেই হইবে।' কিন্তু বৈদান্তিক কাহাকেও শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোনরূপ অধিকার দিতে পারেন না, একেবারেই নয়। একই শক্তি তো সকলের মধ্যেই বিদ্যমান; কোথাও সেই শক্তির অধিক প্রকাশ, কোথাও-বা কিছু অল্প প্রকাশ। একই শক্তি সুপ্তাকারে প্রত্যেকের মধ্যেই রহিয়াছে। অধিকারের দাবী তবে কোথায়? প্রত্যেক জীবেই পূর্ণজ্ঞান বিদ্যমান; অতি মূর্খের মধ্যেও উহা রহিয়াছে, সে এখনও তাহা প্রকাশ করিতে পারে নাই; সম্ভবতঃ প্রকাশের সুযোগ পায় নাই; চতুর্দিকের পরিবেশ হয়তো তাহার অনুকূল হয় নাই। যখন সে সুযোগ পাইবে, তখন তাহা প্রকাশ করিবে। একজন লোক অন্য লোক হইতে বড় হইয়া জন্মিয়াছে—বেদান্ত কখনই এই ধারণা পোষণ করে না। দুইটি জাতির মধ্যে একটি অপরটি অপেক্ষা স্বভাবতই উন্নততর—বৈদান্তিকের নিকট এই ধারণাও একেবারে নিরর্থক। তাহাদিগকেও একই পরিবেশে ফেলিয়া দিয়া দেখ তো—একই-রূপ বুদ্ধিবৃত্তি উহাদের ভিতরে প্রকাশ পায় কিনা। তৎপূর্বে এক জাতি অপর জাতি হইতে বড়—এ-কথা বলিবার তোমার কোনই অধিকার নাই। আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে বলিতে গেলে বলিতে হয়, এই বিষয়ে কাহারও কোন বিশেষ অধিকার দাবী করা উচিত নয়। মনুষ্যজাতির সেবা করাই একটি অধিকার; ইহাই তো ঈশ্বরের আরাধনা। ঈশ্বর এখানেই আছেন, এই সমস্ত মানুষের মধ্যেই আছেন। তিনিই মানুষের অন্তরাত্মা। মানুষ আর কি অধিকার চাহিতে পারে? ঈশ্বরের বিশেষ দূত কেহ নাই, কখনও ছিল না এবং কখনও হইতে পারে না। ছোট বা বড় সমস্ত প্রাণীই সমভাবে ঈশ্বরের রূপ; পার্থক্য কেবল উহার প্রকাশের মধ্যে। চিরপ্রচারিত সেই এক শাশ্বত বাণী তাহাদের নিকট ক্রমে ক্রমে আসিতেছে। সেই শাশ্বত বাণী প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়ে লিখিত হইয়াছে। উহা

সেখানেই বিরাজমান, এবং সকলেই উহা প্রকাশ করিবার জন্য সচেষ্ট। অনুকূল পরিবেশে কেহ কেহ অন্যের তুলনায় ইহা কিছুটা ভালভাবে প্রকাশ করিতে পারিতেছে, কিন্তু বাণীর বাহক হিসাবে তাহারা একই। এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের কী দাবী হইতে পারে? অতীতের সকল ঈশ্বরপ্রেরিতের মত অতি মূর্খ মানব, অতি অজ্ঞান শিশুও ঈশ্বরপ্রেরিত, এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা মহামানব হইবেন, তাঁহারা তাহাদেরই মত; মূর্খতম ও অজ্ঞানতম মানবগণও সমভাবে মহান্। প্রত্যেক জীবের অন্তস্তলে চিরকালের জন্য সেই অনন্ত শাশ্বত বাণী রক্ষিত আছে। জীবমাত্রেরই মধ্যে সেই 'মহতো মহীয়ান্' ব্রহ্মের অনন্ত বাণী নিহিত রহিয়াছে। ইহা তো সদা বর্তমান। সুতরাং অদ্বৈতের কাজ হইল এই-সকল অধিকার ভাঙিয়া দেওয়া। ইহা কঠিনতম কাজ এবং আশ্চর্যের বিষয়—অন্য দেশের তুলনায় স্বীয় জন্মভূমিতেই কম সক্রিয়। অধিকারবাদের যদি কোন দেশ থাকে, তাহা হইলে ইহা সেই দেশই, যে-দেশ এই অদ্বৈতদর্শনের জন্মভূমি—এই দেশেই অধ্যাত্মনিষ্ঠ ব্যক্তির এবং উচ্চবংশজাত ব্যক্তির বিশেষ অধিকার রহিয়াছে। সেখানে অবশ্য আর্থিক অধিকারবাদ ততটা নাই (আমার মনে হয়, ইহাই উহার ভাল দিক্), কিন্তু জন্মগত ও ধর্মগত অধিকার সেখানে সর্বত্র বিদ্যমান।

একবার এই বৈদান্তিক নীতিপ্রচারের প্রচণ্ড চেষ্টা হইয়াছিল; উহা বেশ কয়েক শত বৎসর ধরিয়া সফলও হইয়াছিল। আমরা জানি, ইতিহাসে ঐ কালটি ঐ জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। আমি বৌদ্ধগণের অধিকারবাদ-খণ্ডনের কথা বলিতেছি। বুদ্ধের প্রতি প্রযুক্ত কয়েকটি অতি সুন্দর বিশেষণ আমার মনে আছে। ঐগুলি হইতেছে—'হে তথাগত, তুমি বর্ণাশ্রম-খণ্ডনকারী, তুমি সর্ব-অধিকার-বিধ্বংসী, তুমি সর্বপ্রাণীর ঐক্য-বিঘোষক।' তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, তিনিই একমাত্র ঐক্যের ভাবই প্রচার করিয়াছিলেন। এই ঐক্যভাবের অন্তর্নিহিত শক্তি বুদ্ধের শ্রমণসঙ্ঘ অনেকটা ধরিতে পারে নাই। আমরা দেখিতে পাই, ঐ সঙ্ঘকে একটি উচ্চ ও নীচ পার্থক্য-যুক্ত যাজক-সম্প্রদায়ে পরিণত করিবার শত শত চেষ্টা হইয়াছে। মানুষমাত্রকে যখন বলা হয়, 'তোমরা সকলেই দেবতা', তখনই এই ধরনের সঙ্ঘ গঠন সম্ভব নয়—সঙ্ঘের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া যায় না। বেদান্তের অন্যতম শুভফল হইল ধর্মচিন্তা-বিষয়ে সকলকে স্বাধীনতা দেওয়া; ভারতবর্ষ তাহার

ইতিহাসে সকল যুগেই এই স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছে। ইহা যথার্থ গৌরবের বিষয় যে, ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ, যেখানে কখনও ধর্মের জন্য উৎপীড়ন হয় নাই, যেখানে ধর্ম বিষয়ে মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

বৈদান্তিক নীতির এই বহিরাবরণ-দিকটির পূর্বে যেরূপ প্রয়োজনীয়তা ছিল, এখনও সেইরূপই রহিয়াছে; বরং অতীতের তুলনায় ইহা বোধ হয় অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে, কারণ জ্ঞানের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রকার অধিকার দাবী করাও অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। ঈশ্বর ও শয়তানের ধারণা অথবা অহুরা মাজ্‌দা ও অর্হিমানের ধারণার মধ্যে যথেষ্ট কবিকল্পনা আছে। ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যে পার্থক্য অন্য কিছুতে নয়, কেবল স্বার্থশূন্যতা বা স্বার্থপরতায়। ঈশ্বর যতটুকু জানেন, শয়তানও ততটুকুই জানে; সে ঈশ্বরের মতই শক্তিশালী, কেবল তাহার পবিত্রতা নাই—এই পবিত্রতার অভাবই তাহাকে শয়তান করিয়াছে। এই একই মাপকাঠি বর্তমান জগতের প্রতি প্রয়োগ কর; পবিত্রতা না থাকিলে জ্ঞান ও শক্তির আধিক্য মানুষকে শয়তানে পরিণত করে। বর্তমানে যন্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম-নির্মাণ দ্বারা অসাধারণ শক্তি সঞ্চিত হইতেছে এবং এমন সব অধিকার দাবী করা হইতেছে, যাহা পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্বে কখনও করা হয় নাই। এই কারণেই বেদান্ত এই অধিকারবাদের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে চায়, মানবাত্মার উপর এই উৎপীড়ন চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে চায়।

তোমাদের মধ্যে যাহারা গীতা অধ্যয়ন করিয়াছ, এই স্মরণীয় উক্তিগুলি নিশ্চয়ই তাহাদের মনে আছেঃ 'যাঁহারা বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর অথবা চণ্ডালে সমদর্শী, তাঁহারাই যথার্থ জ্ঞানী, তাঁহারাই যথার্থ পণ্ডিত ব্যক্তি', 'যাঁহাদের মন সর্বত্র সমভাবে অবস্থান করে, তাঁহারা ইহজীবনেই জন্মান্তর জয় করেন; যেহেতু ব্রহ্ম সর্বত্র এক ও গুণদোষাদি-দ্বন্দ্বহীন, সেইহেতু তাঁহারাও ব্রহ্মে অবস্থিত হন অর্থাৎ তাঁহারা জীবন্মুক্ত হন।' সকলের প্রতি এই সমভাব—ইহাই বৈদান্তিক নীতির সারমর্ম। আমরা দেখিয়াছি, আমাদেরই মন বাহ্যজগতের উপর প্রভুত্ব করে। বিষয়ীকে (subject) পরিবর্তন কর, বিষয়ও (object) পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। নিজেকে পবিত্র কর; তাহা হইলে জগৎ

পরিবর্তিত হইতে বাধ্য। এই বিষয়েই বর্তমানে সর্বাপেক্ষা অধিক শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। আমরা উত্তরোত্তর আমাদের প্রতিবেশীদের ব্যাপারেই ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছি; কিন্তু নিজেদের বিষয়ে আমাদের সমীক্ষা ক্রমশই কমিতেছে। আমরা যদি বদলাইয়া যাই, জগৎও বদলাইয়া যাইবে। আমরা যদি পবিত্র হই, জগৎও পবিত্র হইবে। কথা হইতেছে এই যে, অন্যের মধ্যে আমি মন্দ দেখিব কেন? আমি নিজে মন্দ না হইলে কখনও মন্দ দেখিতে পারি না। আমি নিজে দুর্বল না হইলে কখনও কষ্ট পাইতে পারি না। আমার শৈশবে যে-সকল বস্তু আমাকে কষ্ট দিত, এখন তাহারা আর কষ্ট দেয় না। বেদান্ত বলেন–বিষয়ীর পরিবর্তন হওয়াতে বিষয়ও পরিবর্তিত হইতে বাধ্য। যখন আমরা ঐ প্রকার অত্যাশ্চর্য ঐক্য ও সাম্যের অবস্থায় উপনীত হইব, তখন যে-সকল বস্তুকে আমরা দুঃখ ও মন্দের কারণ বলিতেছি, সেগুলিকে উপেক্ষা করিব, সেগুলির দিকে আমরা উপহাসের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব। বেদান্তে ইহাকেই মুক্তিলাভ বলে। মুক্তি যে ক্রমশঃ আসিতেছে, এই সমভাব ও ঐক্যবোধের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই তাহার সূচনা। সুখ ও দুঃখে সমভাব, জয় ও পরাজয়ে তুল্যভাব–এই প্রকার মনই মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে বুঝিতে হইবে। মনকে সহজে জয় করা যায় না। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ব্যাপারে, স্বল্পতম উত্তেজনায় বা বিপদে যে-সকল মন তরঙ্গায়িত হয়, তাহাদের কিরূপ অদ্ভুত অবস্থা ভাবিয়া দেখুন! মনের উপর যখন এই পরিবর্তনগুলি আসে, তখন মহত্ত্ব বা আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে কিছু বলা অবান্তর মাত্র। মনের এই অস্থির অবস্থার পরিবর্তন সাধন করিতেই হইবে। আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে বাহিরের বিরুদ্ধ শক্তি আসিলে আমরা কতটুকুই বা তাহা দ্বারা প্রভাবিত হই, আর উহা সত্ত্বেও কতটুকুই বা আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে পারি। আমাদিগকে সাম্য হইতে বিচ্যুত করিতে উদ্যত সকল শক্তিকে যখন আমরা বাধা দিতে পারিব, তখনই আমরা মুক্তিলাভ করিব, ইহার পূর্বে নয়। এই অব্যাহত সাম্যই মুক্তি। ইহাই মুক্তি; এই অবস্থা ব্যতীত অন্য কিছুকে 'মুক্তি' বলা যাইতে পারে না। এই ধারণা হইতেই–এই উৎস হইতেই সর্বপ্রকার সুন্দর ভাবধারা এই জগতের উপর প্রবাহিত হইয়াছে; প্রকাশভঙ্গীতে আপাততঃ পরস্পরবিরোধী হওয়ায় সাধারণতঃ এগুলি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান। প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমরা দেখিতে পাই–বহু নির্ভীক ও অদ্ভুত অধ্যাত্মভাবাপন্ন ব্যক্তি

বাহ্য-জগতের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ধ্যান-ধারণার জন্য গিরিগুহা বা অরণ্যে বাস করিতেছেন। মুক্তিলাভই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। পক্ষান্তরে আর এক শ্রেণীর প্রতিভাবান্ বরণীয় ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা দুর্গত ও দুর্দশাগ্রস্ত মানবজাতিকে উদ্ধার করিতে সচেষ্ট। আপাততঃ এই দুই পন্থা পরস্পর বিপরীত বলিয়া বোধ হয়। যে-ব্যক্তি মানবসমাজ হইতে দূরে সরিয়া গিয়া গিরিগুহায় বাস করেন, তিনি মানবজাতির অভ্যুত্থানের জন্য ব্যাপৃত ব্যক্তিদের নিতান্ত করুণা ও উপহাসের পাত্র বলিয়া মনে করেন। তিনি বলেন, 'কি মূর্খ! জগতে করণীয় কি আছে? মায়ার জগৎ সর্বদা ঐরূপই থাকিবে। ইহার পরিবর্তন হইতে পারে না।' ভারতবর্ষে আমি যদি আমাদের কোন পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করি, 'আপনি কি বেদান্তে বিশ্বাসী?' তিনি বলিবেন, 'তাই তো আমার ধর্ম; আমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি; বেদান্তই আমার প্রাণ।' 'আচ্ছা, তবে কি আপনি সর্ববস্তুর সাম্যে, সর্বপ্রাণীর ঐক্যে বিশ্বাসী?' তিনি বলিবেন, 'নিশ্চয়ই আমি বিশ্বাস করি।' পরমুহূর্তে যখন একটি নীচ জাতির লোক এই পুরোহিতের নিকটে আসিবে, তখন সেই লোকটির স্পর্শ এড়াইবার জন্য তিনি লাফ দিয়া রাস্তার একধারে চলিয়া যাইবেন। যদি প্রশ্ন করেন, 'আপনি লাফ দিতেছেন কেন?' তিনি বলিবেন, 'কারণ তাহার স্পর্শমাত্রই যে আমাকে অপবিত্র করিয়া ফেলিত।' 'কিন্তু আপনি এই মাত্র তো বলিতেছিলেন, আমরা সকলেই সমান; আপনি তো স্বীকার করেন, আত্মাতে আত্মাতে কোন পার্থক্য নাই।' উত্তরে তিনি বলিবেন, 'ঠিকই, তবে গৃহস্থদের পক্ষে ইহা একটি তত্ত্বমাত্র। যখন বনে যাইব, তখন আমি সকলকে সমান জ্ঞান করিব।' তোমাদের ইংলণ্ডের বংশমর্যাদায় এবং ধনকৌলীন্যে শ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তিকে যদি জিজ্ঞাসা কর, একজন খ্রীষ্টান হিসাবে তিনি মানবভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী কিনা; সকলেই তো ঈশ্বর হইতে আসিয়াছে। তিনি বলিবেন, 'নিশ্চয়ই'; কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তিনি সাধারণ লোক সম্বন্ধে একটা কিছু অশোভন মন্তব্য করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিবেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া মানবভ্রাতৃত্ব একটি 'কথার কথা'-রূপে রহিয়া গিয়াছে; কখনই ইহা কার্যে পরিণত হয় নাই। সকলেই ইহা বুঝে, সত্য বলিয়া ঘোষণা করে, কিন্তু যখনই তুমি তাহাদিগকে ইহা

কার্যে পরিণত করিতে বলিবে, তখনই তাহারা বলিবে, ইহা কার্যে পরিণত করিতে লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগিবে।

একজন রাজার বহুসংখ্যক সভাসদ্ ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই বলিতেন, 'আমার প্রভুর জন্য আমি আমার জীবন বিসর্জন করিতে প্রস্তুত; আমার মত অকপট ব্যক্তি কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই।' কালক্রমে একজন সন্ন্যাসী সেই রাজার নিকট আসিলেন। রাজা তাঁহাকে বলিলেন, 'কোন দিনই কোন রাজার আমার মত এতজন অকপট বিশ্বস্ত সভাসদ্ ছিল না।' সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, 'আমি ইহা বিশ্বাস করি না।' রাজা বলিলেন, 'আপনি ইচ্ছা করিলে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।' ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসী ঘোষণা করিলেন, 'আমি একটি বিরাট যজ্ঞ করিব, যাহা দ্বারা এই রাজার রাজত্ব দীর্ঘকাল থাকিবে। অবশ্য একটা শর্ত আছে—যজ্ঞের জন্য একটি ক্ষুদ্র দুগ্ধ-পুষ্করিণী করিতে হইবে, উহাতে রাজার প্রত্যেক সভাসদকে অন্ধকার রাত্রিতে এক কলসী দুধ ঢালিতে হইবে।' রাজা হাসিয়া বলিলেন, 'ইহাই কি একটা পরীক্ষা?' তিনি তাঁহার সভাসদগণকে তাঁহার নিকট আসিতে বলিলেন এবং কি করিতে হইবে নির্দেশ দিলেন। তাঁহারা সকলে সেই প্রস্তাবে সানন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া গৃহে ফিরিলেন। নিশীথ রাত্রিতে তাঁহারা আসিয়া পুষ্করিণীতে স্ব স্ব কলসী শূন্য করিলেন, কিন্তু প্রভাতে দেখা গেল পুষ্করিণীটি কেবল জলে পূর্ণ। সভাসদগণকে একত্র করাইয়া এই ব্যাপার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইল। তাঁহাদের প্রত্যেকেই ভাবিয়াছিলেন, যখন এত কলসী দুধ ঢালা হইতেছে, তখন তিনি যে জল ঢালিতেছেন, তাহা কেহ ধরিতে পারিবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে অধিকাংশেরই এইরূপ ধারণা। গল্পের সভাসদগণের ন্যায় আমরাও স্ব স্ব ভাগের কাজ ঐরূপে করিয়া যাইতেছি। পুরোহিত বলেন, জগতে এত বেশী ঐক্যের বোধ রহিয়াছে যে, আমি যদি আমার ক্ষুদ্র অধিকারটুকু লইয়া থাকি, তাহা হইলে তাহা কেহ ধরিতে পারিবে না। আমাদের ধনীরাও অনুরূপ বলিয়া থাকেন, প্রত্যেক দেশের উৎপীড়করাও এইরূপ বলে। উৎপীড়কদের তুলনায় উৎপীড়িতদের জীবনে বেশী আশা আছে। উৎপীড়কদের পক্ষে মুক্তিলাভ করিতে অনেক বেশী সময় লাগিবে, অন্যের পক্ষে সময় লাগিবে কম। খেঁকশিয়ালের নিষ্ঠুরতা সিংহের নিষ্ঠুরতা হইতে ভীষণতর। সিংহ একবার আঘাত করিয়া

কিছুকালের জন্য শান্ত থাকে, কিন্তু খেঁকশিয়াল বার বার তাহার শিকারের পশ্চাতে ছুটিবার চেষ্টা করে, একবারও সুযোগ হারায় না। পৌরোহিত্য-প্রথা স্বভাবতই নিষ্ঠুর ও নিষ্করুণ। সেই জন্যই যেখানে পৌরোহিত্য-প্রথার উদ্ভব হয়, সেখানে ধর্মের পতন বা গ্লানি হয়। বেদান্ত বলেন, আমাদিগকে অধিকারের ভাব ছাড়িয়া দিতে হইবে; ইহা ছাড়িলেই ধর্ম আসিবে। তৎপূর্বে কোন ধর্ম আসে না।

তুমি কি খ্রীষ্টের এই কথা বিশ্বাস কর–'তোমার যাহা কিছু আছে, বিক্রয় করিয়া দাও এবং ঐ অর্থ দরিদ্রগণকে দান কর?' এইখানেই যথার্থ ঐক্য, শাস্ত্রবাক্যকে এখানে আপন ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা নাই, এখানে সত্যকে যথাযথভাবে গ্রহণ করা হইতেছে। শাস্ত্রবাক্যকে ইচ্ছানুরূপ ঘুরাইয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিও না। আমি শুনিয়াছি, এইরূপ বলা হয় যে, মুষ্টিমেয় য়াহুদী–যাঁহারা যীশুর উপদেশ শুনিতেন, তাঁহাদিগকেই কেবল এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। তাহা হইলে অন্যান্য ব্যাপারেও একই যুক্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তবে তাঁহার অন্যান্য উপদেশও শুধু য়াহুদীদের জন্য বলা হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে। ইচ্ছানুরূপ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিও না; যথার্থ সত্যের সম্মুখীন হইবার সাহস অবলম্বন কর। যদি বা আমরা সত্যে উপনীত হইতে না পারি, আমরা যেন আমাদের দুর্বলতা, অক্ষমতা স্বীকার করি, কিন্তু আমরা যেন আদর্শকে ক্ষুণ্ন না করি। আমরা যেন অন্তরে এই আশা পোষণ করি–কোন দিন আমরা সত্যে উপনীত হইবই; আমরা ইহার জন্য যেন সচেষ্ট থাকি। আদর্শটি এই–'তোমার যাহা কিছু আছে, বিক্রয় করিয়া দরিদ্রগণকে ঐ অর্থ দান কর এবং আমাকে অনুসরণ কর।' এইরূপে সকল অধিকারকে এবং আমাদের মধ্যে অধিকারের পরিপোষক সবকিছুকে নিষ্পিষ্ট করিয়া আমরা যেন সেই জ্ঞানলাভের চেষ্টা করি, যাহা সকল মানবজাতির প্রতি সাম্যবোধ আনয়ন করিবে। তুমি মনে কর যে, তুমি একটু বেশী মার্জিত ভাষায় কথা কও বলিয়া পথচারী লোকটি অপেক্ষা তুমি উন্নততর। স্মরণ রাখিও, তুমি যখন এইরূপ ভাবিতে থাক, তখন তুমি মুক্তির দিকে অগ্রসর না হইয়া বরং নিজের পায়ের জন্য নূতন শৃঙ্খল নির্মাণ করিতেছ। সর্বোপরি আধ্যাত্মিকতার অহঙ্কার যদি তোমাতে প্রবেশ করে, তবে তোমার সর্বনাশ অনিবার্য। ইহাই সর্বাপেক্ষা নিদারুণ বন্ধন। ঐশ্বর্য বা অন্য কোন বন্ধন মানবাত্মাকে এরূপ শৃঙ্খলিত

করিতে পারে না। ‘আমি অন্যের অপেক্ষা পবিত্রতর’—ইহা অপেক্ষা সর্বনাশকর অন্য কোন চিন্তা মানুষ করিতে পারে না। তুমি কি অর্থে পবিত্র? তোমার অন্তঃস্থিত ঈশ্বর সকলেরই অন্তরে অবস্থিত। তুমি যদি এই তত্ত্ব না জানিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি কিছুই জান নাই। পার্থক্য কি করিয়া থাকিবে? সব বস্তুই এক। প্রত্যেক জীবই সেই সর্ববৃহৎ ‘মহতো মহীয়ান্’ ঈশ্বরের মন্দির। তুমি যদি ইহা দেখিতে পার, তবে ভাল; যদি না পার, তবে আধ্যাত্মিকতা লাভ করিতে তোমার এখনও যথেষ্ট বিলম্ব আছে।

৫. অধিকার

[লণ্ডনের সিসেম ক্লাবে প্রদত্ত বক্তৃতা]

সমগ্র প্রকৃতিতে দুইটি শক্তি ক্রিয়া করিতেছে বলিয়া মনে হয়। একটি সর্বদাই এক বস্তু হইতে অপর বস্তুকে পৃথক্ করিতেছে এবং অপরটি প্রতি মুহূর্তে বস্তুগুলিকে সর্বদা এক সূত্রে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রথমটি উত্তরোত্তর পৃথক্ পৃথক্ সত্তা সৃষ্টি করিতেছে; অন্যটি যেন সত্তাগুলিকে একটি গোষ্ঠীতে পরিণত করিতেছে এবং এই-সব পরিদৃশ্যমান পৃথকত্বের মধ্যে ঐক্য ও সাম্য আনিতেছে। মনে হয়, এই দুইটি শক্তির ক্রিয়া প্রকৃতি ও মনুষ্যজীবনের প্রত্যেক বিভাগে বিদ্যমান। বাহ্যজগতে বা ভৌতিক জগতে এই দুইটি শক্তি অতি স্পষ্টভাবে সক্রিয়, আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই। ইহারা ব্যক্তিভাবগুলিকে পরস্পর পৃথক্ করিতেছে, অন্যগুলি হইতে স্পষ্টতর করিয়া তুলিতেছে; আবার এগুলিকে বিভিন্ন বিভাগে ও শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেছে এবং অভিব্যক্তি ও আকৃতির সাদৃশ্য প্রকাশ করিতেছে। মানুষের সামাজিক জীবনেও এই একই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজ-জীবন গড়িয়া ওঠার সময় হইতেই এই দুইটি শক্তি কাজ করিয়া আসিতেছে—একটি ভেদ সৃষ্টি করিতেছে, অপরটি ঐক্য স্থাপন করিতেছে। ইহাদের ক্রিয়া বিভিন্ন আকারে দেখা দেয় এবং ইহা বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। কিন্তু মূল উপাদান সকলের মধ্যেই বর্তমান। একটির কাজ বস্তুগুলিকে পরস্পর পৃথক্ করা এবং অপরটির কাজ ঐগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা। একটি বর্ণবৈষম্য সৃষ্টি করিতেছে, অপরটি উহা ভাঙিতেছে; একটি শ্রেণী ও অধিকার সৃষ্টি করিতেছে, অপরটি সেগুলি ধ্বংস করিতেছে। সমগ্র বিশ্ব এই দুইটি শক্তির দ্বন্দ্বক্ষেত্র বলিয়া মনে হয়। এক পক্ষ বলে, যদিও এই একীকরণশক্তি বিদ্যমান, তথাপি সর্বশক্তি দ্বারা আমাদিগকে ইহার প্রতিরোধ করিতে হইবে, কারণ ইহা মৃত্যুর দিকে লইয়া যায়। পূর্ণ ঐক্য ও পূর্ণ বিলয় একই কথা; জগতে এই নিত্য-ক্রিয়াশীল বৈষম্য-উৎপাদিকা শক্তি যখন বন্ধ হইয়া যাইবে, তখন জগৎ লোপ পাইবে। বৈষম্য বা বৈচিত্র্যই দৃশ্যমান জগতের কারণ; একীকরণ বা ঐক্য দৃশ্যমান জগৎকে সমরূপ প্রাণহীন

জড়পিণ্ডে পরিণত করে। মানবজাতি অবশ্যই এইরূপ অবস্থা পরিহার করিতে চায়। আমরা আমাদের আশে-পাশে যে-সকল বস্তু ও ব্যাপার দেখি, সেগুলির ক্ষেত্রেও এই একই যুক্তি প্রয়োগ করা হয়। জোরের সহিত এরূপও বলা হয় যে, জড়দেহে এবং সামাজিক শ্রেণী-বিভাগে সম্পূর্ণ সমতা স্বাভাবিক মৃত্যু আনে এবং সমাজের বিলোপ সাধন করে। চিন্তা এবং অনুভূতির ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ সমতা মননশক্তির অপচয় ও অবনতি ঘটায়। সুতরাং সম্পূর্ণ সমতা পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। ইহা এক পক্ষের যুক্তি, প্রত্যেক দেশে বিভিন্ন সময়ে শুধু ভাষার পরিবর্তনের দ্বারা ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে; ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণ যখন জাতিবিভাগ সমর্থন করিতে চান, যখন সমাজের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে একটি বিশেষ শ্রেণীর অধিকার রক্ষা করিতে চান, তখন কার্যতঃ তাঁহারাও এই যুক্তির উপরই জোর দিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণ বলেন, জাতিবিভাগ বিলুপ্ত হইলে সমাজ ধ্বংস হইবে এবং সগর্বে এই ঐতিহাসিক সত্য উপস্থাপিত করেন যে, ভারতীয় ব্রাহ্মণশাসিত সমাজই সর্বাধিক দীর্ঘায়ু। সুতরাং বেশ কিছু জোরের সহিতই তাঁহারা তাঁহাদের এই যুক্তি প্রদর্শন করেন। কিছুটা দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিতই তাঁহারা বলেন, যে সমাজ-ব্যবস্থা মানুষকে অপেক্ষাকৃত অল্পায়ু করে, তাহা অপেক্ষা যে-ব্যবস্থায় সে দীর্ঘতম জীবন লাভ করিতে পারে, তাহা অবশ্যই শ্রেয়ঃ।

পক্ষান্তরে সকল সময়েই ঐক্যের সমর্থক একদল লোক দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদের, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট এবং অন্যান্য মহান্ ধর্মপ্রচারকদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের বর্তমান কাল পর্যন্ত নূতন রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষায়, এবং নিপীড়িত পদদলিত ও অধিকার-বঞ্চিতদের দাবীতে এই ঐক্য ও সমতার বাণীই বিঘোষিত হইতেছে। কিন্তু মানবপ্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করিবেই। যাঁহাদের ব্যক্তিগত সুবিধা আছে, তাঁহারা উহা রাখিতে চান, এবং ইহার পক্ষে কোন যুক্তি পাইলে ঐ যুক্তি যতই অদ্ভুত ও একদেশদর্শী হউক না কেন, তাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকেন। এই মন্তব্য উভয় পক্ষেই প্রযোজ্য।

দর্শনের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন আর একটি রূপ ধারণ করে। বৌদ্ধগণ বলেন, পরিদৃশ্যমান ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য-স্থাপনকারী কোন-কিছুর সন্ধান করার প্রয়োজন নাই; এই

জগৎপ্রপঞ্চ লইয়াই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। বৈচিত্র্য যতই দুঃখজনক ও দুর্বল বলিয়া মনে হউক না কেন, ইহাই জীবনের সারবস্তু, ইহার চেয়ে বেশী আমরা কিছু পাইতে পারি না। বৈদান্তিক বলেন, একমাত্র একত্বই বর্তমান রহিয়াছে। বৈচিত্র্য শুধু বহির্বিষয়ক, ক্ষণস্থায়ী এবং আপাতপ্রতীয়মান। বৈদান্তিক বলেন, 'বৈচিত্র্যের দিকে তাকাইও না। একত্বের নিকট ফিরিয়া যাও।' বৌদ্ধ বলেন, 'ঐক্য পরিহার কর, ইহা একটি ভ্রম। বৈচিত্র্যের দিকে যাও।' ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে মতের এই পার্থক্য আমাদের বর্তমান কাল পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, কারণ প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক তত্ত্বের সংখ্যা খুবই অল্প। দর্শন ও দার্শনিক ভাবধারা, ধর্ম ও ধর্মবিষয়ক জ্ঞান পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করিয়াছিল; আমরা বিভিন্ন ভাষায় একই প্রকার সত্যসমূহের পুনরাবৃত্তি করিতেছি মাত্র; কখনও অভিনব উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে সমৃদ্ধ করিতেছি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আজ পর্যন্ত একই সংগ্রাম চলিতেছে। একপক্ষ চান—আমরা জগৎপ্রপঞ্চ ও উহার এই-সব বিভিন্ন বৈচিত্র্যকে আঁকড়াইয়া থাকি; প্রভূত যুক্তি দ্বারা তাঁহারা দেখাইয়া থাকেন, বৈচিত্র্য থাকিবেই, উহা বন্ধ হইয়া গেলে সব-কিছুই লুপ্ত হইবে। জীবন বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা পরিবর্তন বা বৈচিত্র্য দ্বারাই সংঘটিত হয়। অপর পক্ষ আবার নিঃসঙ্কোচে একত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

নীতিশাস্ত্রে ও আচরণের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এক প্রচণ্ড পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া থাকি। সম্ভবতঃ নীতিশাস্ত্রই একমাত্র বিজ্ঞান, যাহা এই দ্বন্দ্ব হইতে দৃঢ়তার সহিত দূরে রহিয়াছে; কেন-না ঐক্যই যথার্থ নীতি, প্রেমই ইহার ভিত্তি। ইহা তো বৈচিত্র্যের দিকে—পরিবর্তনের দিকে তাকাইবে না। নৈতিক চর্যার একমাত্র লক্ষ্য এই ঐক্য—এই সমতা। বর্তমান কাল পর্যন্ত মানবজাতি যে মহত্তম নৈতিক নিয়মাবলী আবিষ্কার করিয়াছে, সেগুলির কোন পরিবর্তন নাই; একটু অপেক্ষা করিয়া পরিবর্তনের দিকে তাকাইবার তাহাদের সময় নাই। এই নৈতিক নিয়মগুলির একটি উদ্দেশ্য—ঐ একত্ব বা সাম্যের বোধ সুগম করা। ভারতীয় মন—বৈদান্তিক মনকেই আমি ভারতীয় মন মনে করি—অধিকতর বিশ্লেষণপ্রবণ বলিয়া ইহার সকল বিশ্লেষণের ফলস্বরূপ এই ঐক্য আবিষ্কার করিয়াছে এবং সব-কিছুকেই এই একমাত্র ঐক্যের ধারণার উপর স্থাপন করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, এই

একই দেশে অন্য মতবাদীরা—যেমন বৌদ্ধগণ কোথাও ঐ ঐক্য দেখিতে পান নাই। তাঁহাদের নিকট সকল সত্য কতকগুলি বৈচিত্র্যের সমষ্টিমাত্র; একটি বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর কোনই সম্পর্ক নাই।

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের কোন এক পুস্তকে বর্ণিত একটি গল্পের কথা আমার মনে পড়িতেছে। ইহা একটি গ্রীক গল্প—কিভাবে একজন ব্রাহ্মণ এথেন্সে সক্রেটিসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি?' সক্রেটিস উত্তর দিলেন, 'মানুষকে জানাই সকল জ্ঞানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'কিন্তু ঈশ্বরকে না জানিয়া আপনি মানুষকে কিভাবে জানিতে পারেন?' এক পক্ষ—অর্থাৎ বর্তমান ইওরোপের প্রতিনিধি, গ্রীক পক্ষ মানুষকে জানার উপর জোর দিল। পৃথিবীর প্রাচীন ধর্মসমূহের প্রতিনিধি, প্রধানতঃ ভারতীয় পক্ষ ঈশ্বরকে জানার উপর জোর দিয়াছে। এক পক্ষ প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করে, অপর পক্ষ ঈশ্বরের মধ্যে প্রকৃতিকে দর্শন করে। বর্তমানে হয়তো এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দূরে থাকিয়া সমগ্র সমস্যার প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টি অবলম্বন করিবার অধিকার আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। ইহা সত্য যে, বৈচিত্র্য আছে; এবং জীবনের পক্ষে ইহা অপরিহার্য। ইহাও সত্য যে, এই বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া ঐক্য অনুভব করিতে হইবে। ইহা সত্য যে, প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়। আবার ইহাও সত্য যে, ঈশ্বরে আশ্রিতরূপে প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা যায়। মানুষ সম্বন্ধে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, এবং মানুষকে জানিয়াই আমরা ঈশ্বরকে জানিতে পারি। আবার ইহাও সত্য যে, ঈশ্বরের জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, এবং ঈশ্বরকে জানিয়াই আমরা মানুষকে জানিতে পারি। এই উক্তিগুলি আপাতবিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও মনুষ্য-প্রকৃতি অনুযায়ী অপরিহার্য। সমগ্র বিশ্ব—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের এবং ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের ক্রীড়াক্ষেত্র; সমগ্র জগৎ—সাম্য ও বৈষম্যের খেলা; সমগ্র বিশ্ব—অসীমের মধ্যে সসীমের ক্রীড়াভূমি। একটিকে গ্রহণ না করিয়া আমরা অপরটিকে গ্রহণ করিতে পারি না, কিন্তু আমরা ইহাদের দুইটিকে একই অনুভূতির—একই প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তথাপি ব্যাপার সর্বদা এইভাবেই চলিবে।

আমাদের আরও বিশেষ উদ্দেশ্য—ধর্মের বিষয় (নীতির নয়) বলিতে গেলে বলিতে হয়, যতদিন পর্যন্ত সৃষ্টিতে প্রাণের ক্রিয়া চলিবে, ততদিন সর্বপ্রকার ভেদ ও পার্থক্যের বিলয় এবং ফলস্বরূপ এক নিষ্ক্রিয় সমাবস্থা অসম্ভব। এইরূপ অবস্থা বাঞ্ছনীয়ও নয়। আবার এই সত্যের আর একটি দিকও আছে, অর্থাৎ এই ঐক্য তো পূর্ব হইতেই বর্তমান রহিয়াছে। অদ্ভুত দাবী এই—এই ঐক্য স্থাপন করিতে হইবে না, ইহা তো পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। এই ঐক্য ছাড়া বৈচিত্র্য তোমরা মোটেই উপলব্ধি করিতে পারিতে না। ঈশ্বর সৃষ্টি করিতে হইবে না, ঈশ্বর তো পূর্ব হইতেই আছেন। সকল ধর্মই এই দাবী করিয়া আসিতেছেন। যখনই কেহ সান্তকে উপলব্ধি করিয়াছেন, তখনই তিনি অনন্তকেও উপলব্ধি করিয়াছেন। কেহ কেহ সান্তের উপর জোর দিয়া ঘোষণা করিলেন, 'আমরা বহির্জগতে সান্তকেই উপলব্ধি করিয়াছি।' কেহ কেহ অনন্তের উপর জোর দিয়া বলিলেন, 'আমরা কেবল অনন্তকেই উপলব্ধি করিয়াছি।' কিন্তু আমরা জানি, একটি ছাড়া অন্যটি উপলব্ধি করিতে পারি না—ইহা যুক্তির দিক্ দিয়া অপরিহার্য। সুতরাং দাবী করা হইতেছে—এই সমতা, এই ঐক্য, এই পূর্ণতা—যে-কোন নামেই ইহাকে অভিহিত করি না কেন—সৃষ্ট হইতে পারে না, ইহা তো পূর্ব হইতেই বর্তমান এবং এখনও রহিয়াছে। আমাদের কেবল ইহা বুঝিতে হইবে এবং উপলব্ধি করিতে হইবে। আমরা ইহা জানি বা না জানি, পরিষ্কার ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি বা না পারি, এই উপলব্ধি ইন্দ্রিয়ানুভূতির ন্যায় শক্তি ও স্বচ্ছতা লাভ করুক বা না করুক, ইহা বর্তমান রহিয়াছেই। আমাদের মনের যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনের তাগিদেই আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এই ঐক্য বর্তমান রহিয়াছে, তাহা না হইলে সসীমের উপলব্ধি সম্ভব হইত না। আমি 'দ্রব্য' ও 'গুণ'-এর পুরাতন ধারণার কথা বলিতেছি না, আমি একত্বের কথাই বলিতেছি। এই-সব জাগতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে যখনই আমরা 'তুমি' ও 'আমি' পৃথক্—এই উপলব্ধি করিতেছি, তখনই 'তোমার' ও 'আমার' অভিন্নতার উপলব্ধিও স্বতই আমাদের মনে আসিতেছে। এই ঐক্যবোধ ছাড়া জ্ঞান কখনও সম্ভব হইত না। সমতার ধারণা ব্যতীত অনুভূতি বা জ্ঞান কিছুই সম্ভব হইত না। সুতরাং উভয় ধারণাই পাশাপাশি চলিতেছে।

সুতরাং অবস্থার পূর্ণ সমতা নৈতিক আচরণের লক্ষ্য হইলেও তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, সকল মানুষ একরূপ হউক—ইহা কখনই সম্ভব হইবে না। মানুষ পরস্পর পৃথক্ হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। কেহ কেহ অন্য লোকের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী, কেহ কেহ স্বভাবতই ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে, আবার কেহ কেহ এইরূপ হইবে না। কেহ কেহ সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে, কেহ কেহ হইবে না। আমরা কখনও এই পার্থক্য বন্ধ করিতে পারি না। আবার বিভিন্ন আচার্য ঘোষিত এই-সকল আশ্চর্য নীতিবাক্য আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হয়ঃ 'এইরূপে মুনি সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া আত্মা দ্বারা আত্মাকে হিংসা করেন না এবং সেইহেতু তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন। যাঁহাদের মন সর্বভূতস্থ ব্রহ্মে নিশ্চল, ইহজীবনেই তাঁহারা জন্ম-মৃত্যু জয় করিয়াছেন; কারণ ব্রহ্ম নির্দোষ ও সমদর্শী। অতএব তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত।' ইহাই যে যথার্থ ভাব, তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না; তথাপি আবার মুশকিল এই যে, বিভিন্ন বস্তুর আকৃতি ও অবস্থানগত সমতা কখনও লাভ করা যায় না।

কিন্তু অধিকার-বিলোপ আমরা নিশ্চয়ই ঘটাইতে পারি। সমগ্র জগতের সম্মুখে ইহাই যথার্থ কাজ। প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশের সামাজিক জীবনে ইহাই একমাত্র সংগ্রাম। এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীর লোক অপেক্ষা স্বভাবতই বেশী বুদ্ধিমান—ইহা আমাদের সমস্যা নয়; আমাদের সমস্যা হইল এই যে, বুদ্ধির আধিক্যের সুযোগ লইয়া এই শ্রেণীর লোক অল্পবুদ্ধি লোকেদের নিকট হইতে তাহাদের দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যও কাড়িয়া লইবে কিনা। এই বৈষম্যকে ধ্বংস করিবার জন্যই সংগ্রাম। কেহ কেহ অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর দৈহিক বলশালী হইবে এরূপে স্বভাবতই দুর্বল লোকদিগকে দমন বা পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে—ইহা তো স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার, কিন্তু এই শারীরিক শক্তির জন্য তাহারা জীবনের যাহা কিছু সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা যায়, তাহাই নিজেদের জন্য কাড়িয়া লইবে—এই প্রকার অধিকার-বোধ তো নীতিসম্মত নয় এবং ইহার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। একদল লোক স্বভাবসিদ্ধ প্রবণতাবশতঃ অন্যের অপেক্ষা বেশী ধনসঞ্চয় করিতে পারিবে—ইহা তো স্বাভাবিক। কিন্তু ধনসঞ্চয়ের এই সামর্থ্য-হেতু তাহারা অসমর্থ ব্যক্তিদের উৎপীড়ন এবং নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত করিবে—ইহা তো নীতিসম্মত নয়; এই

অধিকারের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। অন্যকে বঞ্চিত করিয়া নিজে সুবিধা ভোগ করার নামই অধিকারবাদ এবং যুগযুগান্ত ধরিয়া নীতিধর্মের লক্ষ্য এই অধিকারবাদকে ধ্বংস করা। বৈচিত্র্যকে নষ্ট না করিয়া সাম্য ও ঐক্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই একমাত্র কাজ।

এই-সকল বৈচিত্র্য পার্থক্য অনন্তকাল বিরাজ করুক। এই বৈচিত্র্য জীবনের অপরিহার্য সারবস্তু। এভাবেই আমরা অনন্তকাল খেলা করিব। তুমি হইবে ধনী এবং আমি হইব দরিদ্র; তুমি হইবে বলবান্ এবং আমি হইব দুর্বল; তুমি হইবে বিদ্বান্ এবং আমি হইব মূর্খ; তুমি হইবে অত্যন্ত আধ্যাত্মিক-ভাবাপন্ন, আমি হইব অল্প আধ্যাত্মিক। তাহাতে কি আসে যায়? আমাদিগকে এরূপই থাকিতে দাও, কিন্তু তুমি আমা অপেক্ষা শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে অধিকতর বলবান্ বলিয়া আমা অপেক্ষা বেশী অধিকার ভোগ করিবে, ইহা হইতে পারে না; আমা অপেক্ষা তোমার ধনৈশ্বর্য বেশী আছে বলিয়া তুমি আমা অপেক্ষা বড় বিবেচিত হইবে, ইহাও হইতে পারে না, কারণ অবস্থার পার্থক্য সত্ত্বেও আমাদের ভিতরে সেই একই সমতা বর্তমান।

বাহ্যজগতে পার্থক্যের বিনাশ এবং সমতার প্রতিষ্ঠা—কখনই নৈতিক আচরণের আদর্শ নয়, এবং কখনও হইবে না। ইহা অসম্ভব, ইহা মৃত্যু ও ধ্বংসের কারণ হইবে। যথার্থ নৈতিক আদর্শ—এই-সকল বৈচিত্র্য সত্ত্বেও অন্তর্নিহিত ঐক্যকে স্বীকার করা, সর্বপ্রকার বিভীষিকা সত্ত্বেও অন্তর্যামী ঈশ্বরকে স্বীকার করা, সর্বপ্রকার আপাত-দুর্বলতা সত্ত্বেও সেই অনন্ত শক্তিকে প্রত্যেকের নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া স্বীকার করা এবং সর্বপ্রকার বিরুদ্ধ বাহ্য প্রতিভাস সত্ত্বেও আত্মার অনন্ত অসীম শুদ্ধস্বরূপতা স্বীকার করা। এই তত্ত্ব আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। কেবল একটা দিক্ গ্রহণ করিলে, সমগ্র তত্ত্বের একাংশমাত্র স্বীকার করিলে উহা বিপজ্জনকই হইবে এবং কলহের পথ প্রশস্ত করিবে। সমগ্র তত্ত্বটি আমাদিগকে যথাযথ গ্রহণ করিতে হইবে এবং ইহাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত-ভাবে আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইহাকে প্রয়োগ করিতে হইবে।

৬. হিন্দু দার্শনিক চিন্তার বিভিন্ন স্তর

যে-শ্রেণীর ধর্মচিন্তার উন্মেষ সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—আমি অবশ্য স্বীকৃতির যোগ্য ধর্মচিন্তার কথাই বলিতেছি, যে-সকল নিম্নস্তরের চিন্তা 'ধর্ম' সংজ্ঞা লাভের অযোগ্য, আমি সেগুলির কথা বলিতেছি না—ঐ উচ্চতর চিন্তারাশির মধ্যে ভগবৎ-প্রেরণা, শাস্ত্রের অলৌকিকতা ইত্যাদি ভাব স্বীকৃত হয়। ঈশ্বরবিশ্বাস হইতেই আদিম ধর্মচিন্তাসমূহ আরম্ভ হয়। এই বিশ্বকে আমরা দেখিতেছি; ইহার স্রষ্টা নিশ্চয়ই কেহ আছেন। জগতে যাহা কিছু আছে, সবই তাঁহার সৃষ্টি। এই ধারণার সহিত পরবর্তী স্তরের চিন্তাধারায় আত্মার ধারণা সম্মিলিত হইয়াছে। আমাদের এই দেহ চক্ষের সম্মুখে বিদ্যমান; ইহার অভ্যন্তরে এমন কিছু আছে, যাহা দেহ নয়। ধর্মের আদিম অবস্থা সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানি, তাহার মধ্যে এইটুকুই প্রাচীনতম। ভারতেও এমন অনেকে ছিলেন, যাঁহারা এই চিন্তাধারার অনুসরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা অত্যল্পকালের মধ্যেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বস্তুতঃ ভারতীয় ধর্ম চিন্তাসমূহ এক অনন্যসাধারণ স্থান হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল। তাই বর্তমান কালে একমাত্র অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বিচার ও অনুমান সহায়ে আমরা কখনও কখনও বুঝিতে সমর্থ হই যে, এইরূপ এক স্তর ভারতীয় চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও বিদ্যমান ছিল। সহজবোধ্য যে স্তরে আমরা ভারতীয় ধর্মচিন্তার পরিচয় লাভ করি, উহা কিন্তু পরবর্তী স্তর, প্রথম স্তর নয়। অতি আদিম স্তরে সৃষ্টির ধারণা বড়ই অভিনব। তখন এই ধারণা ছিল যে, সমগ্র বিশ্ব শূন্যাবস্থা হইতে ঈশ্বরেচ্ছায় সৃষ্ট হইয়াছে; একসময় এই বিশ্বের কিছুই ছিল না এবং সেই সম্পূর্ণ অভাব হইতে ইহার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। পরবর্তী স্তরে আমরা দেখি, এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সংশয় উঠিয়াছে—'অভাব হইতে কিরূপে ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে?' বেদান্তের প্রথম পদক্ষেপেই এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। এই বিশ্বের মধ্যে যদি কোন সত্য নিহিত থাকে, তাহা হইলে ইহা নিশ্চয়ই কোন ভাববস্তু হইতে উদ্গত হইয়াছে, কারণ ইহা অতি সহজেই অনুভূত হয় যে, অভাব হইতে কোথাও কোন ভাববস্তুর উৎপত্তি হয় না। মানুষ হাতে-নাতে যাহা কিছু গড়ে, তাহাই উপাদান-সাপেক্ষ। কোন গৃহ নির্মিত হইয়া থাকিলে তাহার উপাদান পূর্ব হইতেই ছিল;

কোন নৌকা থাকিলে তাহারও উপাদান পূর্ব হইতে ছিল; যদি কোন যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহারও উপাদান পূর্ব হইতে ছিল। যাহা কিছু কার্যবস্তু, তাহা এইভাবেই উৎপন্ন হয়। অতএব অভাব হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে—এই প্রথম ধারণাটি স্বভাবতই বর্জিত হইল এবং এই বিশ্ব যে মূল উপাদান হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক হইল। বস্তুতঃ সমগ্র ধর্মচিন্তার ইতিহাস এই উপাদানের অনুসন্ধানেই পর্যবসিত।

কোন্ বস্তু হইতে এই-সকল উৎপন্ন হইয়াছে? এই সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ বা ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রশ্ন ছাড়াও, ভগবানের বিশ্বসৃষ্টি-বিষয়ক প্রশ্ন ছাড়াও সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন হইল—'কি সেই উপাদান, যাহা হইতে তিনি সৃষ্টি করিলেন?' সকল দর্শনমত যেন এই একটি প্রশ্নের সমাধানেই ব্যাপৃত। ইহার একটি সমাধান হইল এই যে—প্রকৃতি, ঈশ্বর এবং আত্মা এই তিনটিই শাশ্বত সনাতন সত্তা, যেন তিনটি সমান্তরাল রেখা অনন্তকাল ধরিয়া পাশাপাশি চলিতেছে; এই-সকল দার্শনিকের মতে এই তিনটির মধ্যে প্রকৃতি ও আত্মার অস্তিত্ব পরতন্ত্র, কিন্তু ভগবানের সত্তা স্বতন্ত্র। প্রত্যেক দ্রব্যকণিকা যেমন ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন, তেমনি প্রত্যেক আত্মাও তাঁহার ইচ্ছাধীন। ধর্মচিন্তা সম্পর্কে অন্যান্য স্তরের আলোচনার পূর্বে আমরা আত্মার ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করিব এবং দেখিব যে, সকল পাশ্চাত্য দর্শনমতের সহিত বৈদান্তিক দর্শনের এক বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। বেদান্তবাদীরা সকলেই একটি সাধারণ মনোবিজ্ঞান মানিয়া চলেন। দার্শনিক মতবাদ যাহার যাহাই হউক না কেন, ভারতের যাবতীয় মনোবিজ্ঞান একই প্রকার, উহা প্রাচীন সাংখ্য মনস্তত্ত্বের অনুরূপ। এই মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী প্রত্যক্ষানুভূতির ধারা এইঃ বাহ্য ইন্দ্রিয়গোলকের উপর বিষয়গুলি হইতে যে কম্পন প্রথমে সংক্রামিত হয়, তাহা বাহিরের ইন্দ্রিয়গোলক হইতে ভিতরের ইন্দ্রিয়সমূহে সঞ্চারিত হয়; অন্তরিন্দ্রিয় হইতে উহা মনে এবং মন হইতে বুদ্ধিতে প্রেরিত হয়; বুদ্ধি হইতে উহা এমন এক সত্তার নিকট উপস্থিত হয়, যাহা এক এবং যাহাকে তাঁহারা 'আত্মা' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আধুনিক শারীরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আসিলে আমরা দেখিতে পাই যে, উক্ত বিজ্ঞান বিভিন্ন সংবেদনের কেন্দ্রস্থলগুলি আবিষ্কার করিয়াছে। প্রথমতঃ ইহা নিম্নস্তরের কেন্দ্রগুলির সন্ধান পাইয়াছে, তদুপরি উচ্চস্তরের কেন্দ্রগুলির অবস্থান আবিষ্কার করিয়াছে; এই উভয় জাতীয় কেন্দ্রকে ভারতীয় দর্শনের

অন্তরিন্দ্রিয় এবং মনের অনুরূপ বলা যাইতে পারে; কিন্তু এই-সকল বিভিন্ন কেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, এইরূপ কোন একটি বিশেষ কেন্দ্র শারীরবিজ্ঞানে আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং ঐ-সকল বিভিন্ন কেন্দ্রের ঐক্য কোথায়, তাহা শারীরবিজ্ঞান আমাদের বলিতে পারে না। এই-সকল কেন্দ্রের ঐক্য কোথায় সংস্থাপিত? মস্তিষ্কস্থ কেন্দ্রগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, এবং সকল কেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে—এরূপ কোন কেন্দ্র সেখানে নাই। সুতরাং ভারতীয় মনস্তত্ত্ব যতটুকু তথ্য আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি করা চলে না। আমাদের এমন একটি ঐক্যস্থান চাই, যাহার উপর সংবেদনগুলি প্রতিফলিত হইবে, এবং যাহা একটি পূর্ণ অনুভব গড়িয়া তুলিবে। যতক্ষণ না সেই বস্তুটিকে স্বীকার করি, ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের সম্পর্কে বা কোন চিত্র বা অন্য কোন কিছু সম্পর্কে আমরা কোন ঐক্যবদ্ধ ধারণা করিতে পারি না। যদি এই ঐক্যস্থলটি না থাকে, তাহা হইলে আমরা কখনও হয়তো কেবল দেখিব, তাহার কিছুক্ষণ পরে হয়তো নিঃশ্বাস গ্রহণ করিব, তারপর শুনিব, ইত্যাদি। ফলে যখন কাহারও কথা শুনিব, তখন তাহাকে আদৌ দেখিতে পাইব না, কারণ সংবেদনের কেন্দ্রগুলি পরস্পর- বিচ্ছিন্ন।

আমাদের এই শরীর জড়বস্তু নামে পরিচিত কতকগুলি কণিকার সমষ্টি মাত্র। ইহা অনুভূতিহীন ও অচেতন। বৈদান্তিকগণ যাহাকে সূক্ষ্মশরীর বলেন, তাহাও ঐরূপ। তাঁহাদের মতে এই সূক্ষ্মদেহটি স্বচ্ছ হইলেও জড়; ইহা অতি ক্ষুদ্র কণিকাদ্বারা গঠিত; এই কণিকাগুলি এত সূক্ষ্ম যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রসহায়েও সেগুলি দেখা যায় না। ঐ সূক্ষ্ম দেহ কোন্ প্রয়োজনে লাগে? ইহা অতি সূক্ষ্মশক্তির আধার। এই স্থূলদেহ যেমন স্থূলশক্তির আধার, সূক্ষ্মদেহও তেমনি সেই-সকল সূক্ষ্মশক্তির আধার, যাহাকে আমরা বিভিন্ন বৃত্তির আকারে উদিত 'চিন্তা' নামে অভিহিত করি। প্রথমে পাই স্থূলশক্তিসহ স্থূল জড়ের সমষ্টি মানবদেহ। আধার ব্যতীত শক্তি থাকিতে পারে না। শক্তি নিজের অবস্থানের জন্য জড় বস্তুর মুখাপেক্ষী। কাজেই স্থূলতর শক্তি আমাদের এই দেহ-অবলম্বনে কার্য করে এবং এই শক্তিগুলিই আবার সূক্ষ্মাকার ধারণ করে। যে শক্তি স্থূলাকারে কার্য করিতেছে, তাহাই আবার সূক্ষ্মাকার কার্যের আকর হয় এবং চিন্তার আকারে পরিণত হয়। তাহাদের উভয়ের মধ্যে কোন বাস্তব ভেদ নাই; তাহারা একই শক্তির শুধু স্থূল ও সূক্ষ্ম বিকাশ। স্থূলশরীর

এবং সূক্ষ্মশরীরের মধ্যেও কোন বাস্তব ভেদ নাই। সূক্ষ্মদেহও জড়বস্তু দ্বারা গঠিত, যদিও এই জড়পদার্থগুলি অতি সূক্ষ্ম। আর এই স্থূলদেহ যেমন স্থূলশক্তির ক্রিয়ার যন্ত্র, তেমনি এই সূক্ষ্মদেহও সূক্ষ্মশক্তির ক্রিয়ার যন্ত্র। কোথা হইতে এই-সকল শক্তি আসে? বেদান্তদর্শনের মতে প্রকৃতিতে দুইটি বস্তু আছে, একটিকে তাঁহারা 'আকাশ' বলেন; উহাই উপাদান পদার্থ এবং উহা অতি সূক্ষ্ম। অপরটিকে তাঁহারা বলেন 'প্রাণ', উহাই হইল শক্তি। যাহা কিছু আপনারা বায়ু, মাটি বা অন্য কোন পদার্থরূপে দেখেন, স্পর্শ করেন অথবা শুনেন, সে-সবই জড়বস্তু, সবই আকাশ হইতে উৎপন্ন। এগুলি প্রাণের ক্রিয়ার ফলে পরিবর্তিত হইয়া ক্রমশই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অথবা স্থূল হইতে স্থূলতর হইয়া থাকে। আকাশের ন্যায় প্রাণও সর্বব্যাপী এবং সর্বানুস্যূত। আকাশকে যদি জলের সহিত তুলনা করা যায়, তবে বিশ্বের অন্যান্য পদার্থ-সকলকে জল হইতে উৎপন্ন এবং জলের উপর ভাসমান তুষারখণ্ড বলা চলে। যে শক্তি আকাশকে এই বিবিধ আকারে পরিবর্তিত করে, তাহাই হইল প্রাণ। পেশী চালনা, হাঁটা, বসা, কথা বলা ইত্যাদিরূপে স্থূলস্তরে প্রাণের বিকাশের জন্য আকাশ হইতে এই স্থূলদেহরূপ যন্ত্রটি গঠিত হইয়াছে। যাহাতে ঐ একই প্রাণ সূক্ষ্মতর আকারে চিন্তারূপে বিকশিত হইতে পারে, তাই পূর্বোক্ত সূক্ষ্মদেহটিও আকাশ অর্থাৎ আকাশের অতি সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে গঠিত হইয়াছে। সুতরাং সর্বাগ্রে আছে এই স্থূলদেহ, তাহার ঊর্ধ্বে আছে এই সূক্ষ্মদেহ। তাহারও ঊর্ধ্বে আছে জীব বা প্রকৃত মানুষ। নখগুলি যেমন আমাদের দেহের অংশ হইলেও ঐগুলিকে বার বার কাটিয়া ফেলা চলে, স্থূলদেহ এবং সূক্ষ্মদেহের সম্বন্ধও তদনুরূপ। ইহা ঠিক নয় যে, মানবের দুইটি দেহ আছে—একটি সূক্ষ্ম এবং অপরটি স্থূল। প্রকৃতপক্ষে একটি মাত্র দেহই আছে, তবে যে অংশ দীর্ঘস্থায়ী, তাহাকে সূক্ষ্মশরীর এবং যাহা দ্রুতবিনাশী, তাহাকে স্থূলশরীর বলে। যেমন আমি এই নখগুলি যতবার ইচ্ছা কাটিয়া ফেলিতে পারি, সেইরূপ লক্ষ লক্ষ বার আমি এই স্থূলশরীর ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু তবু সূক্ষ্মশরীরটি থাকিয়া যায়। দ্বৈতবাদীদের মতে এই জীব বা প্রকৃত মানব অত্যন্ত সূক্ষ্ম।

এ পর্যন্ত আমরা দেখিয়াছি, 'মানুষ' বলিতে এমন একটি ব্যক্তিকে বুঝায়, যাহার প্রথমতঃ আছে একটি দ্রুত ধ্বংসশীল স্থূলদেহ, তারপর আছে একটি বহুযুগস্থায়ী সূক্ষ্মদেহ,

সর্বোপরি আছে একটি জীবাত্মা। বেদান্তের মতে এই জীবাত্মা ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য। প্রকৃতিও নিত্য, কিন্তু পরিণামী নিত্য। প্রকৃতির যাহা উপাদান—অর্থাৎ প্রাণ এবং আকাশ—তাহাও নিত্য; কিন্তু তাহারা অনন্তকাল ধরিয়া বিভিন্নরূপে পরিবর্তিত হইতেছে। জীব আকাশ কিংবা প্রাণের দ্বারা নির্মিত নয়; ইহা জড়সম্ভূত নয় বলিয়া নিত্য। ইহা প্রাণ ও আকাশের কোন প্রকার মিলনের ফলে উৎপন্ন হয় নাই। যাহা যৌগিক পদার্থ নয়, তাহা কোন দিনই ধ্বংস হইবে না। কারণ ধ্বংসের অর্থ হইল কারণে প্রত্যাবর্তন। স্থূলদেহ আকাশ এবং প্রাণের মিলনে গঠিত; অতএব ইহার ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু জীব যৌগিক পদার্থ নয়; কাজেই তাহার কখনও ধ্বংস নাই। এই একই কারণে ইহা কখনও জন্মে নাই। কোন অযৌগিক পদার্থেরই জন্ম হইতে পারে না। এই একই যুক্তি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একমাত্র যৌগিক পদার্থেরই আরম্ভ সম্ভব। লক্ষ লক্ষ আত্মাসহ এই প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, নিরাকার এবং তিনি প্রকৃতির সহায়ে দিবারাত্রি সকল সময় কার্য করিতেছেন। ইহার সবটুকুই তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি বিশ্বের চিরন্তন অধিপতি। ইহাই হইল দ্বৈতবাদীদের মত। এখন প্রশ্ন এইঃ ঈশ্বরই যদি বিশ্বের নিয়ন্তা হন, তবে কেন তিনি এই পাপময় বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন, কেন আমরা এত দুঃখকষ্ট পাইব? দ্বৈতবাদীদের মতেঃ ইহাতে ঈশ্বরের কোন দোষ নাই। নিজেদের দোষেই আমরা কষ্ট পাই। যেমন কর্ম, তেমনি ফল। তিনি মানুষকে সাজা দিবার জন্য কোন কিছুই করেন নাই। মানুষ দরিদ্র বা অন্ধ হইয়া বা অন্য কোন দূরবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। তাহার কারণ কি? ঐরূপে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে সে নিশ্চয়ই কিছু করিয়াছে। জীব অনন্তকাল ধরিয়া বর্তমান রহিয়াছে এবং কখনও সৃষ্টি হয় নাই। আর এই দীর্ঘকাল ধরিয়া সে কত কিছু করিয়াছে। যাহা কিছু আমরা করি না কেন, তাহার ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়। ভাল কাজ করিলে আমরা সুখী হই, আর মন্দ কাজ করিলে দুঃখ পাই। ঐরূপেই জীব দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে থাকে এবং নানারূপ কার্যও করিতে থাকে। মৃত্যুর পর কি হয়? এই-সকল বেদান্ত সম্প্রদায়গুলির অন্তর্গত সকলেই স্বীকার করেন, জীব স্বরূপতঃ পবিত্র। কিন্তু তাঁহারা বলেন যে, অজ্ঞান জীবের স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখে। পাপকর্ম করিলে যেমন সে অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয়, পুণ্যকর্মের ফলে তেমনই আবার তাহার স্বরূপ-

চেতনা জাগরিত হয়। জীব একদিকে যেমন নিত্য, অপরদিকে তেমনি বিশুদ্ধ। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ।

যখন পুণ্যকর্মের দ্বারা তাহার সমস্ত পাপকর্মের বিলোপ হয়, তখন জীব পুনর্বার বিশুদ্ধ হয় এবং বিশুদ্ধ হইয়া সে 'দেবযান' নামে কথিত পথে ঊর্ধ্বে গমন করে। তখন ইহার বাগিন্দ্রিয় মনে প্রবেশ করে। শব্দের সহায়তা ব্যতীত কেহ চিন্তা করিতে পারে না। চিন্তা থাকিলে শব্দও অবশ্যই থাকিবে। শব্দ যেমন মনে প্রবেশ করে, মনও তেমনি প্রাণে এবং প্রাণ জীবে বিলীন হয়। তখন জীব এই শরীর হইতে দ্রুত বহির্গত হয়, এবং সূর্যলোকে গমন করে। এই বিশ্বজগৎ মণ্ডলাকারে সজ্জিত। এই পৃথিবীকে বলে ভূমণ্ডল, যেখানে চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি দেখা যায়। তাহার ঊর্ধ্বে সূর্যলোক অবস্থিত; তাহার পরে আছে আর একটি লোক, যাহাকে চন্দ্রলোক বলে। তাহারও পরে আছে বিদ্যুল্লোক নামে আর একটি লোক। জীব ঐ বিদ্যুল্লোকে উপস্থিত হইলে পূর্ব হইতে সিদ্ধিপ্রাপ্ত অপর এক ব্যক্তি তাহার অভ্যর্থনার জন্য সেখানে উপস্থিত হন এবং তিনি তাহাকে অপর একটি লোকে অর্থাৎ ব্রহ্মলোক নামক সর্বোত্তম স্বর্গে লইয়া যান। সেখানে জীব অনন্তকাল ধরিয়া বাস করে; তাহার আর জন্ম-মৃত্যু কিছুই হয় না। এই ভাবে জীব অনন্তকাল ধরিয়া আনন্দ ভোগ করে, এবং একমাত্র সৃষ্টিশক্তি ছাড়া ঈশ্বরের আর সর্ববিধ ঐশ্বর্যে ভূষিত হয়। বিশ্বের একমাত্র নিয়ন্তা আছেন এবং তিনি ঈশ্বর। অপর কেহই তাঁহার স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। কেহ যদি ঈশ্বরত্বের দাবী করেন, তাহা হইলে দ্বৈতবাদীদের মতে তিনি ঘোর নাস্তিক। সৃষ্টিশক্তি ছাড়া ঈশ্বরের অপর শক্তিসমূহ জীবে সঞ্চারিত হয়। উক্ত জীবাত্মা যদি শরীর গ্রহণ করিতে চান এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে কর্ম করিতে চান, তাহা হইলে তাহাও করিতে পারেন। তিনি যদি সকল দেবদেবীকে নিজের সম্মুখে আসিতে নির্দেশ দেন, কিংবা যদি পিতৃপুরুষদের আনয়ন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহার ইচ্ছানুসারে তথায় উপস্থিত হন। তাঁহার তখন এমনই শক্তি লাভ হয় যে, তাঁহার আর দুঃখভোগ হয় না, এবং ইচ্ছা করিলে তিনি অনন্তকাল ধরিয়া ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিতে পারেন। তাঁহাকেই বলি শ্রেষ্ঠ মানব—যিনি ঈশ্বরের ভালবাসা অর্জন করিয়াছেন, যিনি সম্পূর্ণরূপে

নিঃস্বার্থ হইয়াছেন, সম্পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করিয়াছেন, সকল বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন এবং উপাসনা ছাড়া অন্য কোন কর্ম করিতে চাহেন না।

অপর একশ্রেণীর জীব আছেন, যাঁহারা এত উন্নত নন; তাঁহারা সৎকর্ম করেন অথচ পুরস্কার প্রত্যাশা করেন। তাঁহারা বলেন—দরিদ্রকে তাঁহারা কিছু দান করিবেন, কিন্তু বিনিময়ে তাঁহারা স্বর্গলাভ কামনা করেন। মৃত্যুর পর তাঁহাদের কিরূপ গতি হয়? তাঁহাদের বাক্য মনে লীন হয়, মন প্রাণে লয় পায়, প্রাণ জীবাত্মায় লীন হয়, জীবাত্মা দেহত্যাগ করিয়া বহির্গত হয় এবং চন্দ্রলোকে যায়। ঐ জীব সেখানে দীর্ঘকালের জন্য অত্যন্ত সুখে সময় অতিবাহিত করেন। তাঁহার সৎকর্মের ফল যতকাল থাকে, ততদিন ধরিয়া তিনি সুখভোগ করেন। যখন সেই সকল নিঃশেষিত হইয়া যায়, তখন তিনি পুনরায় ধরাতলে অবতীর্ণ হন, এবং নিজ বাসনানুযায়ী ধরাধামে নূতন জীবন আরম্ভ করেন। চন্দ্রলোকে জীবগণ দেবজন্ম প্রাপ্ত হয়, কিংবা খ্রীষ্টধর্মে এবং মুসলমান ধর্মে উল্লিখিত দেবদূতরূপে জন্মগ্রহণ করেন। দেবতা অর্থে কতকগুলি উচ্চপদমাত্রই বুঝিতে হইবে। যথা দেবগণের অধিপতিত্ব বা ইন্দ্রত্ব একটি উচ্চপদের নাম। বহু সহস্র মানুষ সেই পদ লাভ করিয়া থাকে। সর্বোত্তম বৈদিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানকারী কোন পুণ্যবান্ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তিনি দেবতার মধ্যে ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হন; এদিকে ততদিনে পূর্ববর্তী ইন্দ্রের পতন হয় এবং তাঁহার পুনর্বার মর্ত্যলোকে জন্মলাভের কাল আসিয়া পড়ে। ইহলোকে যেমন রাজার পরিবর্তন হয়, তেমনই দেবতাদেরও পরিবর্তন হয়, তাঁহাদেরও মৃত্যু হয়। স্বর্গবাসী সকলেরই মৃত্যু আছে। একমাত্র মৃত্যুহীন স্থান হইল ব্রহ্মলোক; সেখানে জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই।

এইরূপে জীবগণ স্বর্গে গমন করেন এবং মাঝে মাঝে দৈত্যদের উৎপাতের কথা ছাড়িয়া দিলে স্বর্গফল তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত সুখকরই হইয়া থাকে। পুরাণের মতে দৈত্য আছে, তাহারা মাঝে মাঝে দেবতাদের নানারূপে তাড়না করে। পৃথিবীর যাবতীয় পুরাণে এই দেবদানবের সংগ্রামের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, আরও দেখা যায় যে, অনেক সময় দৈত্যগণ দেবগণকে জয় করিত। অবশ্য অনেক সময়ই মনে হয়, দেবগণ অপেক্ষা

দৈত্যগণের দুষ্কর্ম বরং কিছু কম। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সকল পুরাণেই দেবগণকে কামপরায়ণ বলিয়া মনে হয়। এইরূপে পুণ্যকর্মের ফলভোগ শেষ হইলে দেবগণের পতন হয়। তখন তাঁহারা মেঘ এবং বারিবিন্দু অবলম্বন করিয়া কোন শস্য বা উদ্ভিদে সঞ্চারিত হন এবং ঐরূপে মানবের দ্বারা ভক্ষিত খাদ্যের মধ্য দিয়া মানবশরীরে প্রবেশ করেন। পিতার নিকট হইতে তাঁহারা উপযুক্ত দেহ-গঠনের উপাদান পান। যখন সেই উপাদানের উপযোগিতা শেষ হইয়া যায়, তখন তাঁহাদের নূতন দেহ সৃষ্টি করিতে হয়। এখন—এরূপ অনেক শয়তান প্রকৃতির লোক আছে, যাহারা নানাপ্রকার দানবীয় কার্য সাধন করে। তাহারা পুনরায় ইতরযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, এবং তাহারা অত্যন্ত হীনকর্মা হইলে অতি নিম্নস্তরের প্রাণিরূপে জন্মগ্রহণ করে অথবা বৃক্ষলতা কিংবা প্রস্তরাদিতে পরিণত হয়।

দেবজন্মে কোন কর্মফল অর্জিত হয় না; একমাত্র মানুষই কর্মফল অর্জন করে। কর্ম বলিতে এমন কাজ বুঝায়, যাহার ফল আছে। যখন মানুষ মরিয়া দেবতা হয়, তখন তাহাদের কেবল সুখ ও আরামের সময়, সেই সময় তাহারা নূতন কর্ম করে না; স্বর্গ তাহাদের অতীত সৎকর্মের পুরস্কার মাত্র। যখন সৎকর্মের ফল নিঃশেষিত হয়, তখন অবশিষ্ট কর্ম তাহার ফল প্রসব করিতে উদ্যত হয়, এবং সেই জীব পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করে। তখন যদি সে অতিশয় শুভ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া আবার নিজেকে শুদ্ধ পবিত্র করিতে পারে, তাহা হইলে সে ব্রহ্মলোকে গমন করে এবং আর পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে না।

নিম্নতর স্তরগুলি হইতে উচ্চস্তরের দিকে ক্রমবিকাশের পথে পশুত্ব একটি সাময়িক অবস্থা মাত্র। সময়ে পশুও মানুষ হয়। ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয় যে, মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পশুদের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। পশুদের আত্মা মানবে রূপায়িত হইতেছে, বহু বিভিন্ন শ্রেণীর পশু ইতঃপূর্বেই মানবে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এই-সকল বিলুপ্ত পশুপক্ষী আর কোথায় বা যাইতে পারে?

বেদে নরকের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রের পরবর্তী কালের গ্রন্থ পুরাণের রচয়িতাদের মনে হইল যে, নরকের কল্পনাকে বাদ দিয়া কোন ধর্ম পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে

না, তাই তাঁহারা নানা রকম নরক কল্পনা করিয়াছেন। এই-সব নরকের কতকগুলিতে মানুষকে করাত দিয়া চিরিয়া দ্বিখণ্ডিত করা হইতেছে এবং তাহাদের উপর অবিরাম যাতনা চলিতেছে, কিন্তু তবু তাহাদের মৃত্যু নাই। তাহারা প্রতি মুহূর্তে তীব্র বেদনায় জর্জরিত হইতেছে। তবে দয়া করিয়া এই-সকল গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, এই-সব যন্ত্রণা চিরস্থায়ী নহে। এই অবস্থায় তাহাদের অসৎ-কর্মের ক্ষয় হয়; অনন্তর তাহারা মর্ত্যে পুনরাগমন করে এবং আবার নূতন সুযোগ পায়। সুতরাং এই মানবদেহে একটি মহা সুযোগ লাভ হয়। তাই ইহাকে কর্ম শরীর বলে। ইহার সাহায্যে আমরা আমাদের নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করি। আমরা একটি বিরাট চক্রে ঘুরিতেছি এবং এই চক্রে এইটিই হইল আমাদের ভবিষ্যৎ-নির্ধারক বিন্দু। সুতরাং এই দেহটিকে জীবের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রূপ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। মানুষ দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

এই পর্যন্ত খাঁটি এবং জটিলতাহীন দ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করা হইল। এইবারে আমরা উচ্চতর বেদান্তদর্শনে আসিতেছি, যাহা পূর্বোক্ত মতবাদকে অযৌক্তিক মনে করে। এই মতে ঈশ্বর এই বিশ্বের উপাদান এবং নিমিত্ত-কারণ—উভয়ই। ঈশ্বরকে যদি আপনারা এক অসীম পুরুষ বলিয়া মানেন, এবং জীবাত্মা ও প্রকৃতিকে অসীম বলেন, তবে আপনারা এই অসীম বস্তুগুলির সংখ্যা যথেচ্ছ বাড়াইয়া যাইতে পারেন; কিন্তু তাহা অত্যন্ত অসম্ভব কথা; এভাবে চলিলে আপনারা সমগ্র ন্যায়শাস্ত্রকে ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিবেন। সুতরাং ঈশ্বর এই বিশ্বের অভিন্ন-নিমিত্ত-উপাদান কারণ; তিনি নিজের মধ্য হইতেই এই বিশ্বকে বাহিরে বিকশিত করিয়াছেন। তাহা হইলে কি ঈশ্বর এই দেওয়াল, এই টেবিল হইয়াছেন, তিনি কি শূকর এবং হত্যাকারী ইত্যাদি জগতের যাবতীয় হীন বস্তু হইয়াছেন? আমরা বলিয়া থাকি, ঈশ্বর শুদ্ধ-স্বভাব। তিনি কিরূপে এই সকল হীন বস্তুতে পরিণত হইতে পারেন? আমাদের উত্তর এই—ইহা ঠিক যেন আমাদেরই মত। এই ধরুন আমি একটি দেহধারী আত্মা। এক অর্থে এই দেহ আমা হইতে পৃথক্ নয়। তথাপি আমি—প্রকৃত আমি—এই দেহ নই; দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আমি নিজেকে শিশু, তরুণ, যুবক বা বৃদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিই; অথচ ইহাতে আমার আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। উহা সর্বদা একই আত্মারূপে অবস্থান করে। ঠিক সেইরূপ প্রকৃতি-সমন্বিত সমগ্র বিশ্ব এবং অগণিত

আত্মাগুলি যেন ঈশ্বরের অসীম দেহ। তিনি এই-সকলের মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া আছেন। একমাত্র তিনিই অপরিবর্তনীয়, কিন্তু প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়, আত্মাও পরিবর্তিত হয়। প্রকৃতি এবং আত্মার পরিবর্তনের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন না। প্রকৃতির পরিবর্তন কিরূপে হয়? প্রকৃতির পরিবর্তন বলিতে রূপের (আকৃতির) পরিবর্তন বুঝায়। ইহা নূতন রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু আত্মার অনুরূপ পরিবর্তন হয় না। আত্মার জ্ঞানের সঙ্কোচন এবং সম্প্রসারণ হয়। অসৎ কর্মের দ্বারা ইহার সঙ্কোচন ঘটে। যে কর্মের দ্বারা আত্মার স্বাভাবিক পবিত্রতা ও জ্ঞানের সঙ্কোচন ঘটে, তাহাকে অশুভ কর্ম বলে। আবার যে-সকল কর্মের ফলে আত্মার মহিমা প্রকাশিত হয়, তাহাকে শুভ কর্ম বলে। সকল আত্মাই পবিত্র ছিল, কিন্তু তাহাদের সঙ্কোচন হইয়াছে। ঈশ্বর-কৃপায় এবং সৎকর্মানুষ্ঠানের দ্বারা আবার তাহারা সম্প্রসারিত হইবে এবং স্বাভাবিক পবিত্রতা লাভ করিবে। প্রত্যেকেরই সমান সুযোগ আছে এবং প্রত্যেকেই অবশেষে অবশ্যই মুক্তির অধিকারী হইবে। কিন্তু এই জগৎ-সংসারের কখনও অবসান হইবে না, কারণ ইহা শাশ্বত। ইহাই হইল দ্বিতীয় মতবাদ। প্রথমটিকে বলা হয় ‘দ্বৈতবাদ’। দ্বিতীয় মতে ঈশ্বর, আত্মা এবং প্রকৃতি—এই তিনটিরই অস্তিত্ব আছে, এবং আত্মা ও প্রকৃতি ঈশ্বরের দেহ; এই তিন মিলিয়া একটি অভিন্ন সত্তা গঠন করিয়াছে। ইহা ধর্মবিকাশের একটি উচ্চতর স্তরের নিদর্শন এবং ইহাকে ‘বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ’ বলা হয়। দ্বৈতবাদে এই বিশ্বকে ঈশ্বর-কর্তৃক চালিত একটি সুবৃহৎ যন্ত্ররূপে কল্পনা করা হয়; বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে ইহাকে জীবদেহের মত একটি জীবন্ত ও পরমাত্মার দ্বারা অনুস্যূত অখণ্ড সত্তারূপে কল্পনা করা হয়।

সর্বশেষে আসিতেছেন অদ্বৈতবাদীরা। তাঁহারাও সেই একই সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন যে, ঈশ্বরকে ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ—এই উভয়ই হইতে হইবে। এই মতে ঈশ্বরই এই সমগ্র বিশ্ব হইয়াছেন এবং এই কথা মোটেই অস্বীকার করা চলে না। অপরেরা যখন বলেন, ঈশ্বর এই বিশ্বের আত্মা, বিশ্ব তাঁহার দেহ এবং সেই দেহ পরিবর্তনশীল হইলেও ঈশ্বর কূটস্থ নিত্য, তখন অদ্বৈতবাদীরা বলেন, ইহা অর্থহীন কথা। তাহাই যদি হয়, তবে ঈশ্বরকে উপাদান-কারণ বলিয়া লাভ কি? উপাদান-কারণ আমরা তাহাকেই বলি, যাহা কার্যে পরিণত হয়; কার্য বলিতে কারণের রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নয়।

কার্য দেখিলেই বুঝিতে হইবে, উহা কারণেরই অন্যরূপে আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এই বিশ্ব যদি কার্য হয় এবং ঈশ্বর যদি কারণ হন, তবে এই বিশ্ব ঈশ্বরেরই অন্যরূপে আবির্ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেহ যদি বলেন, এই বিশ্ব ঈশ্বরের শরীর, ঐ শরীর সঙ্কুচিত ও সূক্ষ্মাকার হইয়া কারণাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ঐ কারণ হইতে এই বিশ্বের উদ্ভব ঘটে, তবে অদ্বৈতবাদী বলিবেন, ফলতঃ ভগবান্ নিজেই এই বিশ্বরূপ ধারণ করেন। এখানে এক অতি সূক্ষ্ম প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে। ভগবানই যদি নিখিলবিশ্ব হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহা অবশ্য স্বীকার্য হইয়া পড়ে—আপনারা সকলে এবং সব-কিছুই ঈশ্বর। এই গ্রন্থখানি ঈশ্বর এবং প্রত্যেক বস্তুই ঈশ্বর। আমার শরীর ঈশ্বর, মনও ঈশ্বর, আত্মাও ঈশ্বর। তাহাই যদি হয়, তবে এত জীবাত্মা আসিল কোথা হইতে? ঈশ্বর কি তবে লক্ষ লক্ষ জীবরূপে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন? সেই এক ঈশ্বরই কি এই লক্ষ লক্ষ জীবে পরিণত হইয়াছেন? ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হইবে? কেমন করিয়া সেই অনন্ত শক্তি ও অসীম বস্তু—বিশ্বের সেই অখণ্ড সত্তা বিখণ্ডিত হইতে পারেন? অসীম বস্তুর বিভাজন সম্ভব নহে। সেই অখণ্ড অবিমিশ্র সত্তা কিরূপে এই বিশ্ব হইতে পারেন? যদি তিনিই এই বিশ্ব হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি পরিবর্তনশীল এবং যদি তিনি পরিবর্তনশীল হন, তাহা হইলে তিনি প্রকৃতির অংশ এবং যাহাই প্রকৃতির অংশ তাহারই পরিবর্তন আছে, জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। যদি আমাদের ঈশ্বর পরিবর্তনশীল হন, তাহা হইলে তাঁহারও কোন-না-কোন দিন মৃত্যু হইবে। এই তথ্যটি সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক। আবার প্রশ্ন, এই ঈশ্বরের কি পরিমাণ অংশ এই বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াছে? যদি এই অংশ (বীজগণিতের অজ্ঞাত পরিমাণ) হয়, তাহা হইলে পরবর্তী সময়ে সেই অংশ বাদ দিয়া অবশিষ্ট পরিমাণ ঈশ্বর বর্তমান রহিলেন। কাজেই সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর যেরূপ ছিলেন, এখন আর তিনি ঠিক সেরূপ রহিলেন না, কারণ তাঁহার ঐ পরিমাণ অংশ এখন বিশ্বে পরিণত হইয়াছে।

অতএব অদ্বৈতবাদীগণ বলেন, 'এই বিশ্বের প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব নাই, এ সকলই মায়া। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড, এই দেবগণ, দেবদূতগণ, জন্মমৃত্যুর অধীন অন্যান্য প্রাণী এবং চক্রবৎ ভ্রাম্যমাণ এই অনন্তকোটি আত্মা—এই সমস্তই স্বপ্নমাত্র।' জীব বলিয়া মোটেই কিছু নাই; অতএব তাহাদের অগণিত সংখ্যাই বা কিরূপে হইবে? একমাত্র সেই অনন্ত সত্তা আছেন।

যেমন একই সূর্য বিভিন্ন জলবিন্দুর উপর প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুরূপে প্রতিভাত হয়, কোটি কোটি জলকণিকা যেমন কোটি কোটি সূর্যকে প্রতিফলিত করে এবং প্রত্যেকটি জলকণিকাই সূর্যের পরিপূর্ণ প্রতিমূর্তি ধারণ করে, অথচ সূর্য একটিমাত্রই থাকে, ঠিক সেইরূপে এই-সকল জীব বিভিন্ন অন্তঃকরণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব মাত্র। এই-সকল বিভিন্ন অন্তঃকরণ যেন বিভিন্ন জলবিন্দুর মত সেই এক সত্তাকে প্রতিফলিত করিতেছে। ঈশ্বর এই-সকল বিভিন্ন জীবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন। কিন্তু সত্যকে বাদ দিয়া কোন নিছক স্বপ্ন থাকিতে পারে না; সেই অনন্ত সত্তাই সেই সত্য। এই শরীর-মন ও আত্মা-রূপে আপনি একটি স্বপ্ন মাত্র; কিন্তু স্বরূপতঃ আপনি সেই সচ্চিদানন্দ, আপনিই এই বিশ্বের ঈশ্বর; আপনিই সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করিতেছেন, আবার আপনাতে টানিয়া লইতেছেন। ইহাই হইল অদ্বৈতবাদীর মত। সুতরাং এই-সকল জন্ম এবং পুনর্জন্ম, এই-সকল আসা-যাওয়া মায়াসৃষ্ট অলীক কল্পনা মাত্র। আপনি তো অসীম। আপনি আবার কোথায় যাইবেন? এই সূর্য, এই চন্দ্র, এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনার সর্বাতীত স্বরূপের মধ্যে যেন কয়েকটি কণিকামাত্র। অতএব আপনার কিরূপে জন্ম-মৃত্যু হইবে? আমি কখনও জন্মগ্রহণ করি নাই এবং কখনও করিব না। আমার কোনদিন পিতা-মাতা, বন্ধু, শত্রু ছিল না, কারণ আমি সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ। আমিই তিনি, আমিই তিনি। তাহা হইলে এই দর্শনের মতে মানবজীবনের লক্ষ্য কি? যাঁহারা উক্ত জ্ঞান লাভ করেন, তাঁহারা বিশ্বের সহিত অভিন্ন হইয়া যান; তাঁহাদের পক্ষে সকল স্বর্গ, এমন কি ব্রহ্মলোকও লয় পায়, সমগ্র স্বপ্ন বিলীন হইয়া যায় এবং তাঁহারা নিজেদের এই বিশ্বের সনাতন ঈশ্বররূপে দেখিতে পান। তাঁহারাই অনন্ত জ্ঞান ও শান্তি-মণ্ডিত প্রকৃত নিজস্ব ব্যক্তিত্ব খুঁজিয়া পান এবং মুক্তি লাভ করেন। তাঁহাদের তখন তুচ্ছবস্তুতে আনন্দের অবসান ঘটে। আমরা এই ক্ষুদ্র দেহে এবং ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বেও আনন্দ পাই। যখন এই সমগ্র বিশ্ব আমার দেহ হইবে, তখন আনন্দ আরও কতগুণ বৃদ্ধি পাইবে! শরীরও যখন সুখের আকর, তখন নিখিল শরীর আমার হইয়া গেলে সুখও যে অপরিমিত হইবে, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন; তখনই মুক্তিলাভ হইবে। ইহাকেই অদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতাতীত বেদান্তদর্শন বলা হয়।

বেদান্তদর্শন এই তিনটি স্তরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে; আমরা ইহার অধিক আর অগ্রসর হইতে পারি না, কারণ একত্বের ঊর্ধ্বে গমন করা সাধ্যাতীত। কোন বিজ্ঞান একবার এই একত্বের ধারণায় উপনীত হইলে আর কোন উপায়েই একত্বকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। মানুষ এই পরম অখণ্ড বস্তুর অতীত আর কিছুই ধারণা করিতে পারে না।

সকল মানুষের পক্ষে এই অদ্বৈতবাদ স্বীকার করা সম্ভব নয়; ইহা অতি দুরূহ। প্রথমতঃ ইহা বুদ্ধি দ্বারা অনুধাবন করাই কঠিন, ইহা বুঝিতে হইলে সূক্ষ্মতম বুদ্ধি এবং ভয়শূন্য অনুভব-শক্তির প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ ইহা অধিকাংশ মানবের পক্ষে উপযোগী নহে। কাজেই এই তিনটি পৃথক্ স্তরের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রথম স্তর হইতে আরম্ভ করিলে মনন এবং নিদিধ্যাসনের ফলে দ্বিতীয়টি আপনিই উদ্ঘাটিত হইবে। ব্যক্তিকেও জাতিরই ন্যায় স্তরে স্তরে অগ্রসর হইতে হইবে। যে-সকল স্তরের মাধ্যমে মানবজাতি উচ্চতম ধর্মচিন্তায় উপনীত হইয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার অনুসরণ করিতে হইবে। তবে একটি স্তর হইতে অপর স্তরে উঠিতে যেখানে মানবজাতিকে হাজার হাজার বৎসর কাটাইতে হইয়াছে, প্রতি ব্যক্তি মানবজাতির সেই জীবনেতিহাস তদপেক্ষা অতি অল্প সময় মধ্যে উদ্‌যাপিত করিতে পারে। তবু আমাদের প্রত্যেককেই এই প্রত্যেকটি স্তরের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। আপনারা যাঁহারা অদ্বৈতবাদী, তাঁহারা নিজেদের জীবনের সেই সময় স্মরণ করুন, যখন আপনারা ঘোর দ্বৈতবাদী ছিলেন। যে মুহূর্তে আপনি নিজেকে দেহ ও মন-রূপে চিন্তা করিবেন, সেই মুহূর্তে এই সমগ্র স্বপ্ন আপনাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ইহার অংশমাত্রকেও স্বীকার করিলে সমগ্রটিকেও স্বীকার করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িবে। যে বলে যে, এই বিশ্ব আছে অথচ তাহার নিয়ামক ঈশ্বর নাই, সে নির্বোধ; কারণ জগৎ থাকিলে তাহার কারণও থাকা আবশ্যক এবং সেই কারণকেই আমরা ঈশ্বর বলিয়া মানি। কারণের অস্তিত্ব না মানিয়া কোন কার্যকে স্বীকার করা অসম্ভব। ভগবানের অস্তিত্ব শুধু তখনই লোপ পাইতে পারে, যখন জগতের কোন অস্তিত্ব থাকে না। তখন আপনি অখণ্ড ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইবেন এবং জগৎ আপনার নিকট মিথ্যা হইয়া যাইবে। যতক্ষণ এই মিথ্যা বোধ থাকিবে, আপনি একটি দেহের সহিত অভিন্ন, ততক্ষণ আপনাকে

নিজের জন্ম-মৃত্যু মানিতেই হইবে। কিন্তু যখন এই স্বপ্ন দূর হইবে, তখনই জন্ম-মৃত্যুর স্বপ্নও বিলীন হইবে এবং বিশ্বের অস্তিত্বের স্বপ্নও ভঙ্গ হইবে। যে বস্তুকে আমরা বর্তমানে বিশ্বরূপে দেখিতেছি, তাহাই তখন পরমাত্মা-রূপে প্রতিভাত হইবে, এবং যে ঈশ্বরকে এতক্ষণ বাহিরে দেখিতেছিলাম, তাঁহাকেই এইবার নিজ হৃদয়ে স্বীয় আত্মা-রূপে দেখিতে পাইব।

৭. হিন্দু দার্শনিক চিন্তার বিভিন্ন স্তর

যে-শ্রেণীর ধর্মচিন্তার উন্মেষ সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—আমি অবশ্য স্বীকৃতির যোগ্য ধর্মচিন্তার কথাই বলিতেছি, যে-সকল নিম্নস্তরের চিন্তা 'ধর্ম' সংজ্ঞা লাভের অযোগ্য, আমি সেগুলির কথা বলিতেছি না—ঐ উচ্চতর চিন্তারাশির মধ্যে ভগবৎ-প্রেরণা, শাস্ত্রের অলৌকিকতা ইত্যাদি ভাব স্বীকৃত হয়। ঈশ্বরবিশ্বাস হইতেই আদিম ধর্মচিন্তাসমূহ আরম্ভ হয়। এই বিশ্বকে আমরা দেখিতেছি; ইহার স্রষ্টা নিশ্চয়ই কেহ আছেন। জগতে যাহা কিছু আছে, সবই তাঁহার সৃষ্টি। এই ধারণার সহিত পরবর্তী স্তরের চিন্তাধারায় আত্মার ধারণা সম্মিলিত হইয়াছে। আমাদের এই দেহ চক্ষের সম্মুখে বিদ্যমান; ইহার অভ্যন্তরে এমন কিছু আছে, যাহা দেহ নয়। ধর্মের আদিম অবস্থা সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানি, তাহার মধ্যে এইটুকুই প্রাচীনতম। ভারতেও এমন অনেকে ছিলেন, যাঁহারা এই চিন্তাধারার অনুসরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা অত্যল্পকালের মধ্যেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বস্তুতঃ ভারতীয় ধর্ম চিন্তাসমূহ এক অনন্যসাধারণ স্থান হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল। তাই বর্তমান কালে একমাত্র অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বিচার ও অনুমান সহায়ে আমরা কখনও কখনও বুঝিতে সমর্থ হই যে, এইরূপ এক স্তর ভারতীয় চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও বিদ্যমান ছিল। সহজবোধ্য যে স্তরে আমরা ভারতীয় ধর্মচিন্তার পরিচয় লাভ করি, উহা কিন্তু পরবর্তী স্তর, প্রথম স্তর নয়। অতি আদিম স্তরে সৃষ্টির ধারণা বড়ই অভিনব। তখন এই ধারণা ছিল যে, সমগ্র বিশ্ব শূন্যাবস্থা হইতে ঈশ্বরেচ্ছায় সৃষ্ট হইয়াছে; একসময় এই বিশ্বের কিছুই ছিল না এবং সেই সম্পূর্ণ অভাব হইতে ইহার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। পরবর্তী স্তরে আমরা দেখি, এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সংশয় উঠিয়াছে—'অভাব হইতে কিরূপে ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে?' বেদান্তের প্রথম পদক্ষেপেই এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। এই বিশ্বের মধ্যে যদি কোন সত্য নিহিত থাকে, তাহা হইলে ইহা নিশ্চয়ই কোন ভাববস্তু হইতে উদ্গত হইয়াছে, কারণ ইহা অতি সহজেই অনুভূত হয় যে, অভাব হইতে কোথাও কোন ভাববস্তুর উৎপত্তি হয় না। মানুষ হাতে-নাতে যাহা কিছু গড়ে, তাহাই উপাদান-সাপেক্ষ। কোন গৃহ নির্মিত হইয়া থাকিলে তাহার উপাদান পূর্ব হইতেই ছিল;

কোন নৌকা থাকিলে তাহারও উপাদান পূর্ব হইতে ছিল; যদি কোন যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহারও উপাদান পূর্ব হইতে ছিল। যাহা কিছু কার্যবস্তু, তাহা এইভাবেই উৎপন্ন হয়। অতএব অভাব হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে—এই প্রথম ধারণাটি স্বভাবতই বর্জিত হইল এবং এই বিশ্ব যে মূল উপাদান হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক হইল। বস্তুতঃ সমগ্র ধর্মচিন্তার ইতিহাস এই উপাদানের অনুসন্ধানেই পর্যবসিত।

কোন্ বস্তু হইতে এই-সকল উৎপন্ন হইয়াছে? এই সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ বা ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রশ্ন ছাড়াও, ভগবানের বিশ্বসৃষ্টি-বিষয়ক প্রশ্ন ছাড়াও সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন হইল—'কি সেই উপাদান, যাহা হইতে তিনি সৃষ্টি করিলেন?' সকল দর্শনমত যেন এই একটি প্রশ্নের সমাধানেই ব্যাপৃত। ইহার একটি সমাধান হইল এই যে—প্রকৃতি, ঈশ্বর এবং আত্মা এই তিনটিই শাশ্বত সনাতন সত্তা, যেন তিনটি সমান্তরাল রেখা অনন্তকাল ধরিয়া পাশাপাশি চলিতেছে; এই-সকল দার্শনিকের মতে এই তিনটির মধ্যে প্রকৃতি ও আত্মার অস্তিত্ব পরতন্ত্র, কিন্তু ভগবানের সত্তা স্বতন্ত্র। প্রত্যেক দ্রব্যকণিকা যেমন ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন, তেমনি প্রত্যেক আত্মাও তাঁহার ইচ্ছাধীন। ধর্মচিন্তা সম্পর্কে অন্যান্য স্তরের আলোচনার পূর্বে আমরা আত্মার ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করিব এবং দেখিব যে, সকল পাশ্চাত্য দর্শনমতের সহিত বৈদান্তিক দর্শনের এক বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। বেদান্তবাদীরা সকলেই একটি সাধারণ মনোবিজ্ঞান মানিয়া চলেন। দার্শনিক মতবাদ যাহার যাহাই হউক না কেন, ভারতের যাবতীয় মনোবিজ্ঞান একই প্রকার, উহা প্রাচীন সাংখ্য মনস্তত্ত্বের অনুরূপ। এই মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী প্রত্যক্ষানুভূতির ধারা এইঃ বাহ্য ইন্দ্রিয়গোলকের উপর বিষয়গুলি হইতে যে কম্পন প্রথমে সংক্রামিত হয়, তাহা বাহিরের ইন্দ্রিয়গোলক হইতে ভিতরের ইন্দ্রিয়সমূহে সঞ্চারিত হয়; অন্তরিন্দ্রিয় হইতে উহা মনে এবং মন হইতে বুদ্ধিতে প্রেরিত হয়; বুদ্ধি হইতে উহা এমন এক সত্তার নিকট উপস্থিত হয়, যাহা এক এবং যাহাকে তাঁহারা 'আত্মা' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আধুনিক শারীরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আসিলে আমরা দেখিতে পাই যে, উক্ত বিজ্ঞান বিভিন্ন সংবেদনের কেন্দ্রস্থলগুলি আবিষ্কার করিয়াছে। প্রথমতঃ ইহা নিম্নস্তরের কেন্দ্রগুলির সন্ধান পাইয়াছে, তদুপরি উচ্চস্তরের কেন্দ্রগুলির অবস্থান আবিষ্কার করিয়াছে; এই উভয় জাতীয় কেন্দ্রকে ভারতীয় দর্শনের

অন্তরিন্দ্রিয় এবং মনের অনুরূপ বলা যাইতে পারে; কিন্তু এই-সকল বিভিন্ন কেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, এইরূপ কোন একটি বিশেষ কেন্দ্র শারীরবিজ্ঞানে আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং ঐ-সকল বিভিন্ন কেন্দ্রের ঐক্য কোথায়, তাহা শারীরবিজ্ঞান আমাদের বলিতে পারে না। এই-সকল কেন্দ্রের ঐক্য কোথায় সংস্থাপিত? মস্তিষ্কস্থ কেন্দ্রগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, এবং সকল কেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে—এরূপ কোন কেন্দ্র সেখানে নাই। সুতরাং ভারতীয় মনস্তত্ত্ব যতটুকু তথ্য আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি করা চলে না। আমাদের এমন একটি ঐক্যস্থান চাই, যাহার উপর সংবেদনগুলি প্রতিফলিত হইবে, এবং যাহা একটি পূর্ণ অনুভব গড়িয়া তুলিবে। যতক্ষণ না সেই বস্তুটিকে স্বীকার করি, ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের সম্পর্কে বা কোন চিত্র বা অন্য কোন কিছু সম্পর্কে আমরা কোন ঐক্যবদ্ধ ধারণা করিতে পারি না। যদি এই ঐক্যস্থলটি না থাকে, তাহা হইলে আমরা কখনও হয়তো কেবল দেখিব, তাহার কিছুক্ষণ পরে হয়তো নিঃশ্বাস গ্রহণ করিব, তারপর শুনিব, ইত্যাদি। ফলে যখন কাহারও কথা শুনিব, তখন তাহাকে আদৌ দেখিতে পাইব না, কারণ সংবেদনের কেন্দ্রগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন।

আমাদের এই শরীর জড়বস্তু নামে পরিচিত কতকগুলি কণিকার সমষ্টি মাত্র। ইহা অনুভূতিহীন ও অচেতন। বৈদান্তিকগণ যাহাকে সূক্ষ্মশরীর বলেন, তাহাও ঐরূপ। তাঁহাদের মতে এই সূক্ষ্মদেহটি স্বচ্ছ হইলেও জড়; ইহা অতি ক্ষুদ্র কণিকাদ্বারা গঠিত; এই কণিকাগুলি এত সূক্ষ্ম যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রসহায়েও সেগুলি দেখা যায় না। ঐ সূক্ষ্ম দেহ কোন্ প্রয়োজনে লাগে? ইহা অতি সূক্ষ্মশক্তির আধার। এই স্থূলদেহ যেমন স্থূলশক্তির আধার, সূক্ষ্মদেহও তেমনি সেই-সকল সূক্ষ্মশক্তির আধার, যাহাকে আমরা বিভিন্ন বৃত্তির আকারে উদিত 'চিন্তা' নামে অভিহিত করি। প্রথমে পাই স্থূলশক্তিসহ স্থূল জড়ের সমষ্টি মানবদেহ। আধার ব্যতীত শক্তি থাকিতে পারে না। শক্তি নিজের অবস্থানের জন্য জড় বস্তুর মুখাপেক্ষী। কাজেই স্থূলতর শক্তি আমাদের এই দেহ-অবলম্বনে কার্য করে এবং এই শক্তিগুলিই আবার সূক্ষ্মাকার ধারণ করে। যে শক্তি স্থূলাকারে কার্য করিতেছে, তাহাই আবার সূক্ষ্মাকার কার্যের আকর হয় এবং চিন্তার আকারে পরিণত হয়। তাহাদের উভয়ের মধ্যে কোন বাস্তব ভেদ নাই; তাহারা একই শক্তির শুধু স্থূল ও সূক্ষ্ম বিকাশ। স্থূলশরীর

এবং সূক্ষ্মশরীরের মধ্যেও কোন বাস্তব ভেদ নাই। সূক্ষ্মদেহও জড়বস্তু দ্বারা গঠিত, যদিও এই জড়পদার্থগুলি অতি সূক্ষ্ম। আর এই স্থূলদেহ যেমন স্থূলশক্তির ক্রিয়ার যন্ত্র, তেমনি এই সূক্ষ্মদেহও সূক্ষ্মশক্তির ক্রিয়ার যন্ত্র। কোথা হইতে এই-সকল শক্তি আসে? বেদান্তদর্শনের মতে প্রকৃতিতে দুইটি বস্তু আছে, একটিকে তাঁহারা 'আকাশ' বলেন; উহাই উপাদান পদার্থ এবং উহা অতি সূক্ষ্ম। অপরটিকে তাঁহারা বলেন 'প্রাণ', উহাই হইল শক্তি। যাহা কিছু আপনারা বায়ু, মাটি বা অন্য কোন পদার্থরূপে দেখেন, স্পর্শ করেন অথবা শুনেন, সে-সবই জড়বস্তু, সবই আকাশ হইতে উৎপন্ন। এগুলি প্রাণের ক্রিয়ার ফলে পরিবর্তিত হইয়া ক্রমশই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অথবা স্থূল হইতে স্থূলতর হইয়া থাকে। আকাশের ন্যায় প্রাণও সর্বব্যাপী এবং সর্বানুস্যূত। আকাশকে যদি জলের সহিত তুলনা করা যায়, তবে বিশ্বের অন্যান্য পদার্থ-সকলকে জল হইতে উৎপন্ন এবং জলের উপর ভাসমান তুষারখণ্ড বলা চলে। যে শক্তি আকাশকে এই বিবিধ আকারে পরিবর্তিত করে, তাহাই হইল প্রাণ। পেশী চালনা, হাঁটা, বসা, কথা বলা ইত্যাদিরূপে স্থূলস্তরে প্রাণের বিকাশের জন্য আকাশ হইতে এই স্থূলদেহরূপ যন্ত্রটি গঠিত হইয়াছে। যাহাতে ঐ একই প্রাণ সূক্ষ্মতর আকারে চিন্তারূপে বিকশিত হইতে পারে, তাই পূর্বোক্ত সূক্ষ্মদেহটিও আকাশ অর্থাৎ আকাশের অতি সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে গঠিত হইয়াছে। সুতরাং সর্বাগ্রে আছে এই স্থূলদেহ, তাহার ঊর্ধ্বে আছে এই সূক্ষ্মদেহ। তাহারও ঊর্ধ্বে আছে জীব বা প্রকৃত মানুষ। নখগুলি যেমন আমাদের দেহের অংশ হইলেও ঐগুলিকে বার বার কাটিয়া ফেলা চলে, স্থূলদেহ এবং সূক্ষ্মদেহের সম্বন্ধও তদনুরূপ। ইহা ঠিক নয় যে, মানবের দুইটি দেহ আছে—একটি সূক্ষ্ম এবং অপরটি স্থূল। প্রকৃতপক্ষে একটি মাত্র দেহই আছে, তবে যে অংশ দীর্ঘস্থায়ী, তাহাকে সূক্ষ্মশরীর এবং যাহা দ্রুতবিনাশী, তাহাকে স্থূলশরীর বলে। যেমন আমি এই নখগুলি যতবার ইচ্ছা কাটিয়া ফেলিতে পারি, সেইরূপ লক্ষ লক্ষ বার আমি এই স্থূলশরীর ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু তবু সূক্ষ্মশরীরটি থাকিয়া যায়। দ্বৈতবাদীদের মতে এই জীব বা প্রকৃত মানব অত্যন্ত সূক্ষ্ম।

এ পর্যন্ত আমরা দেখিয়াছি, 'মানুষ' বলিতে এমন একটি ব্যক্তিকে বুঝায়, যাহার প্রথমতঃ আছে একটি দ্রুত ধ্বংসশীল স্থূলদেহ, তারপর আছে একটি বহুযুগস্থায়ী সূক্ষ্মদেহ,

সর্বোপরি আছে একটি জীবাত্মা। বেদান্তের মতে এই জীবাত্মা ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য। প্রকৃতিও নিত্য, কিন্তু পরিণামী নিত্য। প্রকৃতির যাহা উপাদান—অর্থাৎ প্রাণ এবং আকাশ—তাহাও নিত্য; কিন্তু তাহারা অনন্তকাল ধরিয়া বিভিন্নরূপে পরিবর্তিত হইতেছে। জীব আকাশ কিংবা প্রাণের দ্বারা নির্মিত নয়; ইহা জড়সম্ভূত নয় বলিয়া নিত্য। ইহা প্রাণ ও আকাশের কোন প্রকার মিলনের ফলে উৎপন্ন হয় নাই। যাহা যৌগিক পদার্থ নয়, তাহা কোন দিনই ধ্বংস হইবে না। কারণ ধ্বংসের অর্থ হইল কারণে প্রত্যাবর্তন। স্থূলদেহ আকাশ এবং প্রাণের মিলনে গঠিত; অতএব ইহার ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু জীব যৌগিক পদার্থ নয়; কাজেই তাহার কখনও ধ্বংস নাই। এই একই কারণে ইহা কখনও জন্মে নাই। কোন অযৌগিক পদার্থেরই জন্ম হইতে পারে না। এই একই যুক্তি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একমাত্র যৌগিক পদার্থেরই আরম্ভ সম্ভব। লক্ষ লক্ষ আত্মাসহ এই প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, নিরাকার এবং তিনি প্রকৃতির সহায়ে দিবারাত্রি সকল সময় কার্য করিতেছেন। ইহার সবটুকুই তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি বিশ্বের চিরন্তন অধিপতি। ইহাই হইল দ্বৈতবাদীদের মত। এখন প্রশ্ন এইঃ ঈশ্বরই যদি বিশ্বের নিয়ন্তা হন, তবে কেন তিনি এই পাপময় বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন, কেন আমরা এত দুঃখকষ্ট পাইব? দ্বৈতবাদীদের মতেঃ ইহাতে ঈশ্বরের কোন দোষ নাই। নিজেদের দোষেই আমরা কষ্ট পাই। যেমন কর্ম, তেমনি ফল। তিনি মানুষকে সাজা দিবার জন্য কোন কিছুই করেন নাই। মানুষ দরিদ্র বা অন্ধ হইয়া বা অন্য কোন দূরবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। তাহার কারণ কি? ঐরূপে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে সে নিশ্চয়ই কিছু করিয়াছে। জীব অনন্তকাল ধরিয়া বর্তমান রহিয়াছে এবং কখনও সৃষ্টি হয় নাই। আর এই দীর্ঘকাল ধরিয়া সে কত কিছু করিয়াছে। যাহা কিছু আমরা করি না কেন, তাহার ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়। ভাল কাজ করিলে আমরা সুখী হই, আর মন্দ কাজ করিলে দুঃখ পাই। ঐরূপেই জীব দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে থাকে এবং নানারূপ কার্যও করিতে থাকে। মৃত্যুর পর কি হয়? এই-সকল বেদান্ত সম্প্রদায়গুলির অন্তর্গত সকলেই স্বীকার করেন, জীব স্বরূপতঃ পবিত্র। কিন্তু তাঁহারা বলেন যে, অজ্ঞান জীবের স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখে। পাপকর্ম করিলে যেমন সে অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয়, পুণ্যকর্মের ফলে তেমনই আবার তাহার স্বরূপ-

চেতনা জাগরিত হয়। জীব একদিকে যেমন নিত্য, অপরদিকে তেমনি বিশুদ্ধ। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ।

যখন পুণ্যকর্মের দ্বারা তাহার সমস্ত পাপকর্মের বিলোপ হয়, তখন জীব পুনর্বার বিশুদ্ধ হয় এবং বিশুদ্ধ হইয়া সে 'দেবযান' নামে কথিত পথে ঊর্ধ্বে গমন করে। তখন ইহার বাগিন্দ্রিয় মনে প্রবেশ করে। শব্দের সহায়তা ব্যতীত কেহ চিন্তা করিতে পারে না। চিন্তা থাকিলে শব্দও অবশ্যই থাকিবে। শব্দ যেমন মনে প্রবেশ করে, মনও তেমনি প্রাণে এবং প্রাণ জীবে বিলীন হয়। তখন জীব এই শরীর হইতে দ্রুত বহির্গত হয়, এবং সূর্যলোকে গমন করে। এই বিশ্বজগৎ মণ্ডলাকারে সজ্জিত। এই পৃথিবীকে বলে ভূমণ্ডল, যেখানে চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি দেখা যায়। তাহার ঊর্ধ্বে সূর্যলোক অবস্থিত; তাহার পরে আছে আর একটি লোক, যাহাকে চন্দ্রলোক বলে। তাহারও পরে আছে বিদ্যুল্লোক নামে আর একটি লোক। জীব ঐ বিদ্যুল্লোকে উপস্থিত হইলে পূর্ব হইতে সিদ্ধিপ্রাপ্ত অপর এক ব্যক্তি তাহার অভ্যর্থনার জন্য সেখানে উপস্থিত হন এবং তিনি তাহাকে অপর একটি লোকে অর্থাৎ ব্রহ্মলোক নামক সর্বোত্তম স্বর্গে লইয়া যান। সেখানে জীব অনন্তকাল ধরিয়া বাস করে; তাহার আর জন্ম-মৃত্যু কিছুই হয় না। এই ভাবে জীব অনন্তকাল ধরিয়া আনন্দ ভোগ করে, এবং একমাত্র সৃষ্টিশক্তি ছাড়া ঈশ্বরের আর সর্ববিধ ঐশ্বর্যে ভূষিত হয়। বিশ্বের একমাত্র নিয়ন্তা আছেন এবং তিনি ঈশ্বর। অপর কেহই তাঁহার স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। কেহ যদি ঈশ্বরত্বের দাবী করেন, তাহা হইলে দ্বৈতবাদীদের মতে তিনি ঘোর নাস্তিক। সৃষ্টিশক্তি ছাড়া ঈশ্বরের অপর শক্তিসমূহ জীবে সঞ্চারিত হয়। উক্ত জীবাত্মা যদি শরীর গ্রহণ করিতে চান এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে কর্ম করিতে চান, তাহা হইলে তাহাও করিতে পারেন। তিনি যদি সকল দেবদেবীকে নিজের সম্মুখে আসিতে নির্দেশ দেন, কিংবা যদি পিতৃপুরুষদের আনয়ন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহার ইচ্ছানুসারে তথায় উপস্থিত হন। তাঁহার তখন এমনই শক্তি লাভ হয় যে, তাঁহার আর দুঃখভোগ হয় না, এবং ইচ্ছা করিলে তিনি অনন্তকাল ধরিয়া ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিতে পারেন। তাঁহাকেই বলি শ্রেষ্ঠ মানব—যিনি ঈশ্বরের ভালবাসা অর্জন করিয়াছেন, যিনি সম্পূর্ণরূপে

নিঃস্বার্থ হইয়াছেন, সম্পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করিয়াছেন, সকল বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন এবং উপাসনা ছাড়া অন্য কোন কর্ম করিতে চাহেন না।

অপর একশ্রেণীর জীব আছেন, যাঁহারা এত উন্নত নন; তাঁহারা সৎকর্ম করেন অথচ পুরস্কার প্রত্যাশা করেন। তাঁহারা বলেন—দরিদ্রকে তাঁহারা কিছু দান করিবেন, কিন্তু বিনিময়ে তাঁহারা স্বর্গলাভ কামনা করেন। মৃত্যুর পর তাঁহাদের কিরূপ গতি হয়? তাঁহাদের বাক্য মনে লীন হয়, মন প্রাণে লয় পায়, প্রাণ জীবাত্মায় লীন হয়, জীবাত্মা দেহত্যাগ করিয়া বহির্গত হয় এবং চন্দ্রলোকে যায়। ঐ জীব সেখানে দীর্ঘকালের জন্য অত্যন্ত সুখে সময় অতিবাহিত করেন। তাঁহার সৎকর্মের ফল যতকাল থাকে, ততদিন ধরিয়া তিনি সুখভোগ করেন। যখন সেই সকল নিঃশেষিত হইয়া যায়, তখন তিনি পুনরায় ধরাতলে অবতীর্ণ হন, এবং নিজ বাসনানুযায়ী ধরাধামে নূতন জীবন আরম্ভ করেন। চন্দ্রলোকে জীবগণ দেবজন্ম প্রাপ্ত হয়, কিংবা খ্রীষ্টধর্মে এবং মুসলমান ধর্মে উল্লিখিত দেবদূতরূপে জন্মগ্রহণ করেন। দেবতা অর্থে কতকগুলি উচ্চপদমাত্রই বুঝিতে হইবে। যথা দেবগণের অধিপতিত্ব বা ইন্দ্রত্ব একটি উচ্চপদের নাম। বহু সহস্র মানুষ সেই পদ লাভ করিয়া থাকে। সর্বোত্তম বৈদিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানকারী কোন পুণ্যবান্ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তিনি দেবতার মধ্যে ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হন; এদিকে ততদিনে পূর্ববর্তী ইন্দ্রের পতন হয় এবং তাঁহার পুনর্বার মর্ত্যলোকে জন্মলাভের কাল আসিয়া পড়ে। ইহলোকে যেমন রাজার পরিবর্তন হয়, তেমনই দেবতাদেরও পরিবর্তন হয়, তাঁহাদেরও মৃত্যু হয়। স্বর্গবাসী সকলেরই মৃত্যু আছে। একমাত্র মৃত্যুহীন স্থান হইল ব্রহ্মলোক; সেখানে জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই।

এইরূপে জীবগণ স্বর্গে গমন করেন এবং মাঝে মাঝে দৈত্যদের উৎপাতের কথা ছাড়িয়া দিলে স্বর্গফল তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত সুখকরই হইয়া থাকে। পুরাণের মতে দৈত্য আছে, তাহারা মাঝে মাঝে দেবতাদের নানারূপে তাড়না করে। পৃথিবীর যাবতীয় পুরাণে এই দেবদানবের সংগ্রামের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, আরও দেখা যায় যে, অনেক সময় দৈত্যগণ দেবগণকে জয় করিত। অবশ্য অনেক সময়ই মনে হয়, দেবগণ অপেক্ষা

দৈত্যগণের দুষ্কর্ম বরং কিছু কম। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সকল পুরাণেই দেবগণকে কামপরায়ণ বলিয়া মনে হয়। এইরূপে পুণ্যকর্মের ফলভোগ শেষ হইলে দেবগণের পতন হয়। তখন তাঁহারা মেঘ এবং বারিবিন্দু অবলম্বন করিয়া কোন শস্য বা উদ্ভিদে সঞ্চারিত হন এবং ঐরূপে মানবের দ্বারা ভক্ষিত খাদ্যের মধ্য দিয়া মানবশরীরে প্রবেশ করেন। পিতার নিকট হইতে তাঁহারা উপযুক্ত দেহ-গঠনের উপাদান পান। যখন সেই উপাদানের উপযোগিতা শেষ হইয়া যায়, তখন তাঁহাদের নূতন দেহ সৃষ্টি করিতে হয়। এখন–এরূপ অনেক শয়তান প্রকৃতির লোক আছে, যাহারা নানাপ্রকার দানবীয় কার্য সাধন করে। তাহারা পুনরায় ইতরযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, এবং তাহারা অত্যন্ত হীনকর্মা হইলে অতি নিম্নস্তরের প্রাণিরূপে জন্মগ্রহণ করে অথবা বৃক্ষলতা কিংবা প্রস্তরাদিতে পরিণত হয়।

দেবজন্মে কোন কর্মফল অর্জিত হয় না; একমাত্র মানুষই কর্মফল অর্জন করে। কর্ম বলিতে এমন কাজ বুঝায়, যাহার ফল আছে। যখন মানুষ মরিয়া দেবতা হয়, তখন তাহাদের কেবল সুখ ও আরামের সময়, সেই সময় তাহারা নূতন কর্ম করে না; স্বর্গ তাহাদের অতীত সৎকর্মের পুরস্কার মাত্র। যখন সৎকর্মের ফল নিঃশেষিত হয়, তখন অবশিষ্ট কর্ম তাহার ফল প্রসব করিতে উদ্যত হয়, এবং সেই জীব পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করে। তখন যদি সে অতিশয় শুভ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া আবার নিজেকে শুদ্ধ পবিত্র করিতে পারে, তাহা হইলে সে ব্রহ্মলোকে গমন করে এবং আর পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে না।

নিম্নতর স্তরগুলি হইতে উচ্চস্তরের দিকে ক্রমবিকাশের পথে পশুত্ব একটি সাময়িক অবস্থা মাত্র। সময়ে পশুও মানুষ হয়। ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয় যে, মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পশুদের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। পশুদের আত্মা মানবে রূপায়িত হইতেছে, বহু বিভিন্ন শ্রেণীর পশু ইতঃপূর্বেই মানবে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এই-সকল বিলুপ্ত পশুপক্ষী আর কোথায় বা যাইতে পারে?

বেদে নরকের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রের পরবর্তী কালের গ্রন্থ পুরাণের রচয়িতাদের মনে হইল যে, নরকের কল্পনাকে বাদ দিয়া কোন ধর্ম পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে

না, তাই তাঁহারা নানা রকম নরক কল্পনা করিয়াছেন। এই-সব নরকের কতকগুলিতে মানুষকে করাত দিয়া চিরিয়া দ্বিখণ্ডিত করা হইতেছে এবং তাহাদের উপর অবিরাম যাতনা চলিতেছে, কিন্তু তবু তাহাদের মৃত্যু নাই। তাহারা প্রতি মুহূর্তে তীব্র বেদনায় জর্জরিত হইতেছে। তবে দয়া করিয়া এই-সকল গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, এই-সব যন্ত্রণা চিরস্থায়ী নহে। এই অবস্থায় তাহাদের অসৎ-কর্মের ক্ষয় হয়; অনন্তর তাহারা মর্ত্যে পুনরাগমন করে এবং আবার নূতন সুযোগ পায়। সুতরাং এই মানবদেহে একটি মহা সুযোগ লাভ হয়। তাই ইহাকে কর্ম শরীর বলে। ইহার সাহায্যে আমরা আমাদের নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করি। আমরা একটি বিরাট চক্রে ঘুরিতেছি এবং এই চক্রে এইটিই হইল আমাদের ভবিষ্যৎ-নির্ধারক বিন্দু। সুতরাং এই দেহটিকে জীবের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রূপ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। মানুষ দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

এই পর্যন্ত খাঁটি এবং জটিলতাহীন দ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করা হইল। এইবারে আমরা উচ্চতর বেদান্তদর্শনে আসিতেছি, যাহা পূর্বোক্ত মতবাদকে অযৌক্তিক মনে করে। এই মতে ঈশ্বর এই বিশ্বের উপাদান এবং নিমিত্ত-কারণ—উভয়ই। ঈশ্বরকে যদি আপনারা এক অসীম পুরুষ বলিয়া মানেন, এবং জীবাত্মা ও প্রকৃতিকে অসীম বলেন, তবে আপনারা এই অসীম বস্তুগুলির সংখ্যা যথেচ্ছ বাড়াইয়া যাইতে পারেন; কিন্তু তাহা অত্যন্ত অসম্ভব কথা; এভাবে চলিলে আপনারা সমগ্র ন্যায়শাস্ত্রকে ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিবেন। সুতরাং ঈশ্বর এই বিশ্বের অভিন্ন-নিমিত্ত-উপাদান কারণ; তিনি নিজের মধ্য হইতেই এই বিশ্বকে বাহিরে বিকশিত করিয়াছেন। তাহা হইলে কি ঈশ্বর এই দেওয়াল, এই টেবিল হইয়াছেন, তিনি কি শূকর এবং হত্যাকারী ইত্যাদি জগতের যাবতীয় হীন বস্তু হইয়াছেন? আমরা বলিয়া থাকি, ঈশ্বর শুদ্ধ-স্বভাব। তিনি কিরূপে এই সকল হীন বস্তুতে পরিণত হইতে পারেন? আমাদের উত্তর এই—ইহা ঠিক যেন আমাদেরই মত। এই ধরুন আমি একটি দেহধারী আত্মা। এক অর্থে এই দেহ আমা হইতে পৃথক্ নয়। তথাপি আমি—প্রকৃত আমি—এই দেহ নই; দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আমি নিজেকে শিশু, তরুণ, যুবক বা বৃদ্ধা বলিয়া পরিচয় দিই; অথচ ইহাতে আমার আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। উহা সর্বদা একই আত্মারূপে অবস্থান করে। ঠিক সেইরূপ প্রকৃতি-সমন্বিত সমগ্র বিশ্ব এবং অগণিত

আত্মাগুলি যেন ঈশ্বরের অসীম দেহ। তিনি এই-সকলের মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া আছেন। একমাত্র তিনিই অপরিবর্তনীয়, কিন্তু প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়, আত্মাও পরিবর্তিত হয়। প্রকৃতি এবং আত্মার পরিবর্তনের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন না। প্রকৃতির পরিবর্তন কিরূপে হয়? প্রকৃতির পরিবর্তন বলিতে রূপের (আকৃতির) পরিবর্তন বুঝায়। ইহা নূতন রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু আত্মার অনুরূপ পরিবর্তন হয় না। আত্মার জ্ঞানের সঙ্কোচন এবং সম্প্রসারণ হয়। অসৎ কর্মের দ্বারা ইহার সঙ্কোচন ঘটে। যে কর্মের দ্বারা আত্মার স্বাভাবিক পবিত্রতা ও জ্ঞানের সঙ্কোচন ঘটে, তাহাকে অশুভ কর্ম বলে। আবার যে-সকল কর্মের ফলে আত্মার মহিমা প্রকাশিত হয়, তাহাকে শুভ কর্ম বলে। সকল আত্মাই পবিত্র ছিল, কিন্তু তাহাদের সঙ্কোচন হইয়াছে। ঈশ্বর-কৃপায় এবং সৎকর্মানুষ্ঠানের দ্বারা আবার তাহারা সম্প্রসারিত হইবে এবং স্বাভাবিক পবিত্রতা লাভ করিবে। প্রত্যেকেরই সমান সুযোগ আছে এবং প্রত্যেকেই অবশেষে অবশ্যই মুক্তির অধিকারী হইবে। কিন্তু এই জগৎ-সংসারের কখনও অবসান হইবে না, কারণ ইহা শাশ্বত। ইহাই হইল দ্বিতীয় মতবাদ। প্রথমটিকে বলা হয় 'দ্বৈতবাদ'। দ্বিতীয় মতে ঈশ্বর, আত্মা এবং প্রকৃতি—এই তিনটিরই অস্তিত্ব আছে, এবং আত্মা ও প্রকৃতি ঈশ্বরের দেহ; এই তিন মিলিয়া একটি অভিন্ন সত্তা গঠন করিয়াছে। ইহা ধর্মবিকাশের একটি উচ্চতর স্তরের নিদর্শন এবং ইহাকে 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' বলা হয়। দ্বৈতবাদে এই বিশ্বকে ঈশ্বর-কর্তৃক চালিত একটি সুবৃহৎ যন্ত্ররূপে কল্পনা করা হয়; বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে ইহাকে জীবদেহের মত একটি জীবন্ত ও পরমাত্মার দ্বারা অনুস্যূত অখণ্ড সত্তারূপে কল্পনা করা হয়।

সর্বশেষে আসিতেছেন অদ্বৈতবাদীরা। তাঁহারাও সেই একই সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন যে, ঈশ্বরকে ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ—এই উভয়ই হইতে হইবে। এই মতে ঈশ্বরই এই সমগ্র বিশ্ব হইয়াছেন এবং এই কথা মোটেই অস্বীকার করা চলে না। অপরেরা যখন বলেন, ঈশ্বর এই বিশ্বের আত্মা, বিশ্ব তাঁহার দেহ এবং সেই দেহ পরিবর্তনশীল হইলেও ঈশ্বর কূটস্থ নিত্য, তখন অদ্বৈতবাদীরা বলেন, ইহা অর্থহীন কথা। তাহাই যদি হয়, তবে ঈশ্বরকে উপাদান-কারণ বলিয়া লাভ কি? উপাদান-কারণ আমরা তাহাকেই বলি, যাহা কার্যে পরিণত হয়; কার্য বলিতে কারণের রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নয়।

কার্য দেখিলেই বুঝিতে হইবে, উহা কারণেরই অন্যরূপে আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এই বিশ্ব যদি কার্য হয় এবং ঈশ্বর যদি কারণ হন, তবে এই বিশ্ব ঈশ্বরেরই অন্যরূপে আবির্ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেহ যদি বলেন, এই বিশ্ব ঈশ্বরের শরীর, ঐ শরীর সঙ্কুচিত ও সূক্ষ্মাকার হইয়া কারণাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ঐ কারণ হইতে এই বিশ্বের উদ্ভব ঘটে, তবে অদ্বৈতবাদী বলিবেন, ফলতঃ ভগবান্ নিজেই এই বিশ্বরূপ ধারণ করেন। এখানে এক অতি সূক্ষ্ম প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে। ভগবানই যদি নিখিলবিশ্ব হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহা অবশ্য স্বীকার্য হইয়া পড়ে—আপনারা সকলে এবং সব-কিছুই ঈশ্বর। এই গ্রন্থখানি ঈশ্বর এবং প্রত্যেক বস্তুই ঈশ্বর। আমার শরীর ঈশ্বর, মনও ঈশ্বর, আত্মাও ঈশ্বর। তাহাই যদি হয়, তবে এত জীবাত্মা আসিল কোথা হইতে? ঈশ্বর কি তবে লক্ষ লক্ষ জীবরূপে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন? সেই এক ঈশ্বরই কি এই লক্ষ লক্ষ জীবে পরিণত হইয়াছেন? ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হইবে? কেমন করিয়া সেই অনন্ত শক্তি ও অসীম বস্তু—বিশ্বের সেই অখণ্ড সত্তা বিখণ্ডিত হইতে পারেন? অসীম বস্তুর বিভাজন সম্ভব নহে। সেই অখণ্ড অবিমিশ্র সত্তা কিরূপে এই বিশ্ব হইতে পারেন? যদি তিনিই এই বিশ্ব হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি পরিবর্তনশীল এবং যদি তিনি পরিবর্তনশীল হন, তাহা হইলে তিনি প্রকৃতির অংশ এবং যাহাই প্রকৃতির অংশ তাহারই পরিবর্তন আছে, জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। যদি আমাদের ঈশ্বর পরিবর্তনশীল হন, তাহা হইলে তাঁহারও কোন-না-কোন দিন মৃত্যু হইবে। এই তথ্যটি সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক। আবার প্রশ্ন, এই ঈশ্বরের কি পরিমাণ অংশ এই বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াছে? যদি এই অংশ (বীজগণিতের অজ্ঞাত পরিমাণ) হয়, তাহা হইলে পরবর্তী সময়ে সেই অংশ বাদ দিয়া অবশিষ্ট পরিমাণ ঈশ্বর বর্তমান রহিলেন। কাজেই সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর যেরূপ ছিলেন, এখন আর তিনি ঠিক সেরূপ রহিলেন না, কারণ তাঁহার ঐ পরিমাণ অংশ এখন বিশ্বে পরিণত হইয়াছে।

অতএব অদ্বৈতবাদীগণ বলেন, ‘এই বিশ্বের প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব নাই, এ সকলই মায়া। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড, এই দেবগণ, দেবদূতগণ, জন্মমৃত্যুর অধীন অন্যান্য প্রাণী এবং চক্রবৎ ভ্রাম্যমাণ এই অনন্তকোটি আত্মা—এই সমস্তই স্বপ্নমাত্র।’ জীব বলিয়া মোটেই কিছু নাই; অতএব তাহাদের অগণিত সংখ্যাই বা কিরূপে হইবে? একমাত্র সেই অনন্ত সত্তা আছেন।

যেমন একই সূর্য বিভিন্ন জলবিন্দুর উপর প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুরূপে প্রতিভাত হয়, কোটি কোটি জলকণিকা যেমন কোটি কোটি সূর্যকে প্রতিফলিত করে এবং প্রত্যেকটি জলকণিকাই সূর্যের পরিপূর্ণ প্রতিমূর্তি ধারণ করে, অথচ সূর্য একটিমাত্রই থাকে, ঠিক সেইরূপে এই-সকল জীব বিভিন্ন অন্তঃকরণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব মাত্র। এই-সকল বিভিন্ন অন্তঃকরণ যেন বিভিন্ন জলবিন্দুর মত সেই এক সত্তাকে প্রতিফলিত করিতেছে। ঈশ্বর এই-সকল বিভিন্ন জীবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন। কিন্তু সত্যকে বাদ দিয়া কোন নিছক স্বপ্ন থাকিতে পারে না; সেই অনন্ত সত্তাই সেই সত্য। এই শরীর-মন ও আত্মা-রূপে আপনি একটি স্বপ্ন মাত্র; কিন্তু স্বরূপতঃ আপনি সেই সচ্চিদানন্দ, আপনিই এই বিশ্বের ঈশ্বর; আপনিই সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করিতেছেন, আবার আপনাতে টানিয়া লইতেছেন। ইহাই হইল অদ্বৈতবাদীর মত। সুতরাং এই-সকল জন্ম এবং পুনর্জন্ম, এই-সকল আসা-যাওয়া মায়াসৃষ্ট অলীক কল্পনা মাত্র। আপনি তো অসীম। আপনি আবার কোথায় যাইবেন? এই সূর্য, এই চন্দ্র, এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনার সর্বাতীত স্বরূপের মধ্যে যেন কয়েকটি কণিকামাত্র। অতএব আপনার কিরূপে জন্ম-মৃত্যু হইবে? আমি কখনও জন্মগ্রহণ করি নাই এবং কখনও করিব না। আমার কোনদিন পিতা-মাতা, বন্ধু, শত্রু ছিল না, কারণ আমি সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ। আমিই তিনি, আমিই তিনি। তাহা হইলে এই দর্শনের মতে মানবজীবনের লক্ষ্য কি? যাঁহারা উক্ত জ্ঞান লাভ করেন, তাঁহারা বিশ্বের সহিত অভিন্ন হইয়া যান; তাঁহাদের পক্ষে সকল স্বর্গ, এমন কি ব্রহ্মলোকও লয় পায়, সমগ্র স্বপ্ন বিলীন হইয়া যায় এবং তাঁহারা নিজেদের এই বিশ্বের সনাতন ঈশ্বররূপে দেখিতে পান। তাঁহারাই অনন্ত জ্ঞান ও শান্তি- মণ্ডিত প্রকৃত নিজস্ব ব্যক্তিত্ব খুঁজিয়া পান এবং মুক্তি লাভ করেন। তাঁহাদের তখন তুচ্ছবস্তুতে আনন্দের অবসান ঘটে। আমরা এই ক্ষুদ্র দেহে এবং ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বেও আনন্দ পাই। যখন এই সমগ্র বিশ্ব আমার দেহ হইবে, তখন আনন্দ আরও কতগুণ বৃদ্ধি পাইবে! শরীরও যখন সুখের আকর, তখন নিখিল শরীর আমার হইয়া গেলে সুখও যে অপরিমিত হইবে, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন; তখনই মুক্তিলাভ হইবে। ইহাকেই অদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতাতীত বেদান্তদর্শন বলা হয়।

বেদান্তদর্শন এই তিনটি স্তরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে; আমরা ইহার অধিক আর অগ্রসর হইতে পারি না, কারণ একত্বের ঊর্ধ্বে গমন করা সাধ্যাতীত। কোন বিজ্ঞান একবার এই একত্বের ধারণায় উপনীত হইলে আর কোন উপায়েই একত্বকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। মানুষ এই পরম অখণ্ড বস্তুর অতীত আর কিছুই ধারণা করিতে পারে না।

সকল মানুষের পক্ষে এই অদ্বৈতবাদ স্বীকার করা সম্ভব নয়; ইহা অতি দুরূহ। প্রথমতঃ ইহা বুদ্ধি দ্বারা অনুধাবন করাই কঠিন, ইহা বুঝিতে হইলে সূক্ষ্মতম বুদ্ধি এবং ভয়শূন্য অনুভব-শক্তির প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ ইহা অধিকাংশ মানবের পক্ষে উপযোগী নহে। কাজেই এই তিনটি পৃথক্ স্তরের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রথম স্তর হইতে আরম্ভ করিলে মনন এবং নিদিধ্যাসনের ফলে দ্বিতীয়টি আপনিই উদ্ঘাটিত হইবে। ব্যক্তিকেও জাতিরই ন্যায় স্তরে স্তরে অগ্রসর হইতে হইবে। যে-সকল স্তরের মাধ্যমে মানবজাতি উচ্চতম ধর্মচিন্তায় উপনীত হইয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার অনুসরণ করিতে হইবে। তবে একটি স্তর হইতে অপর স্তরে উঠিতে যেখানে মানবজাতিকে হাজার হাজার বৎসর কাটাইতে হইয়াছে, প্রতি ব্যক্তি মানবজাতির সেই জীবনেতিহাস তদপেক্ষা অতি অল্প সময় মধ্যে উদ্যাপিত করিতে পারে। তবু আমাদের প্রত্যেককেই এই প্রত্যেকটি স্তরের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। আপনারা যাঁহারা অদ্বৈতবাদী, তাঁহারা নিজেদের জীবনের সেই সময় স্মরণ করুন, যখন আপনারা ঘোর দ্বৈতবাদী ছিলেন। যে মুহূর্তে আপনি নিজেকে দেহ ও মন-রূপে চিন্তা করিবেন, সেই মুহূর্তে এই সমগ্র স্বপ্ন আপনাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ইহার অংশমাত্রকেও স্বীকার করিলে সমগ্রটিকেও স্বীকার করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িবে। যে বলে যে, এই বিশ্ব আছে অথচ তাহার নিয়ামক ঈশ্বর নাই, সে নির্বোধ; কারণ জগৎ থাকিলে তাহার কারণও থাকা আবশ্যক এবং সেই কারণকেই আমরা ঈশ্বর বলিয়া মানি। কারণের অস্তিত্ব না মানিয়া কোন কার্যকে স্বীকার করা অসম্ভব। ভগবানের অস্তিত্ব শুধু তখনই লোপ পাইতে পারে, যখন জগতের কোন অস্তিত্ব থাকে না। তখন আপনি অখণ্ড ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইবেন এবং জগৎ আপনার নিকট মিথ্যা হইয়া যাইবে। যতক্ষণ এই মিথ্যা বোধ থাকিবে, আপনি একটি দেহের সহিত অভিন্ন, ততক্ষণ আপনাকে

নিজের জন্ম-মৃত্যু মানিতেই হইবে। কিন্তু যখন এই স্বপ্ন দূর হইবে, তখনই জন্ম-মৃত্যুর স্বপ্নও বিলীন হইবে এবং বিশ্বের অস্তিত্বের স্বপ্নও ভঙ্গ হইবে। যে বস্তুকে আমরা বর্তমানে বিশ্বরূপে দেখিতেছি, তাহাই তখন পরমাত্মা-রূপে প্রতিভাত হইবে, এবং যে ঈশ্বরকে এতক্ষণ বাহিরে দেখিতেছিলাম, তাঁহাকেই এইবার নিজ হৃদয়ে স্বীয় আত্মা-রূপে দেখিতে পাইব।

৮. বৌদ্ধধর্ম ও বেদান্ত

বৌদ্ধধর্মের ও ভারতের অন্যান্য সকল ধর্মমতের ভিত্তি বেদান্ত। কিন্তু যাহাকে আমরা আধুনিক কালের অদ্বৈত দর্শন বলি, উহার অনেকগুলি সিদ্ধান্ত বৌদ্ধদের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। হিন্দুরা অর্থাৎ সনাতন-পন্থী হিন্দুরা অবশ্য ইহা স্বীকার করিবে না। তাহাদের নিকট বৌদ্ধেরা বিরুদ্ধবাদী পাষণ্ড। কিন্তু বিরুদ্ধবাদী বৌদ্ধগণকেও অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য সমগ্র মতবাদটি প্রসারিত করার একটি সচেতন প্রয়াস রহিয়াছে।

বৌদ্ধধর্মের সহিত বেদান্তের কোন বিবাদ নাই। বেদান্তের উদ্দেশ্য সকল মতের সমন্বয় করা। মহাযানী বৌদ্ধদের সহিত আমাদের কোন কলহ নাই, কিন্তু বর্মী, শ্যামদেশীয় ও সমস্ত হীনযানীরা বলে যে, পরিদৃশ্যমান জগৎ একটি আছে এবং জিজ্ঞাসা করেঃ এই দৃশ্যজগতের পশ্চাতে একটি অতীন্দ্রিয় জগৎ সৃষ্টি করিবার কি অধিকার আমাদের আছে? বেদান্তের উত্তরঃ এই উক্তি মিথ্যা। বেদান্ত কখনও স্বীকার করে না যে, একটি দৃশ্য জগৎ ও একটি অতীন্দ্রিয় জগৎ আছে; একটি মাত্র জগৎ আছে। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দেখিলে উহাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা সব সময়েই ইন্দ্রিয়াতীত। যে রজ্জু দেখে, সে সর্প দেখে না। উহা হয় রজ্জু, না হয় সর্প; কিন্তু একসঙ্গে কখনও দুইটি নয়। সুতরাং বৌদ্ধেরা যে বলে, আমরা হিন্দুরা দুইটি জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, উহা সর্বৈব ভুল। ইচ্ছা করিলে জগৎকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিবার অধিকার তাহাদের আছে, কিন্তু ইহাকে ইন্দ্রিয়াতীত বলিবার কোন অধিকার অপরের নাই—এ-কথা বলিয়া বিবাদ করিবার কোন অধিকার তাহাদের নাই।

বৌদ্ধধর্ম দৃশ্য জগৎ ব্যতীত অন্য কিছু স্বীকার করিতে চায় না। একমাত্র দৃশ্যজগতেই তৃষ্ণা আছে। তৃষ্ণাই এই সব-কিছু সৃষ্টি করিতেছে। আধুনিক বৈদান্তিকেরা কিন্তু এই মত আদৌ গ্রহণ করে না। আমরা বলি, একটা কিছু আছে, যাহা ইচ্ছায় পরিণত হইয়াছে। ইচ্ছা একটি উৎপন্ন বস্তু—যৌগিক পদার্থ, 'মৌলিক' নয়। একটি বাহ্যবস্তু না থাকিলে কোন ইচ্ছা হইতে পারে না। ইচ্ছা হইতে জগতের সৃষ্টি—এই সিদ্ধান্তের অসম্ভাব্যতা আমরা

সহজেই দেখিতে পাই। ইহা কি করিয়া হইতে পারে? বাহিরের প্রেরণা ছাড়া ইচ্ছার উৎপত্তি হইতে কখনও দেখিয়াছ কি? উত্তেজনা ব্যতীত, অথবা আধুনিক দর্শনের পরিভাষায় স্নায়বিক উত্তেজনা ব্যতীত বাসনা উঠিতে পারে না। ইচ্ছা মস্তিষ্কের এক-প্রকার প্রতিক্রিয়া-বিশেষ, সাংখ্যবাদীরা ইহাকে বলে 'বুদ্ধি'। এই প্রতিক্রিয়ার পূর্বে ক্রিয়া থাকিবেই, এবং ক্রিয়া থাকিলেই একটি বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। যখন স্থূল জগৎ থাকে না, তখন স্বভাবতই ইচ্ছাও থাকিবে না; তথাপি তোমাদের মতে ইচ্ছাই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। ইচ্ছা সৃষ্টি করে কে? ইচ্ছা জগতের সহিত সহাবস্থিত। যে উত্তেজনা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে, উহাই ইচ্ছা নামক পদার্থও সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু দর্শন নিশ্চয়ই এখানে থামিবে না। ইচ্ছা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সুতরাং জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত হইতে পারি না। ইচ্ছা একটি যৌগিক পদার্থ—বাহিরের ও ভিতরের মিশ্রণ। মনে কর একটি মানুষ কোন ইন্দ্রিয় ছাড়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে লোকটির আদৌ ইচ্ছা থাকিবে না। ইচ্ছার জন্য প্রয়োজন কোন বাহ্য বিষয়ের, এবং মস্তিষ্ক ভিতর হইতে কিছু শক্তি লাভ করে। কাজেই দেওয়াল বা অন্য যে-কোন বস্তু যতখানি যৌগিক পদার্থ, ইচ্ছাও ঠিক ততখানি যৌগিক পদার্থ। জার্মান দার্শনিকদের ইচ্ছাশক্তি-বিষয়ক মতবাদের সহিত আমরা মোটেই একমত হইতে পারি না। ইচ্ছা নিজেই জ্ঞেয় পদার্থ, কাজেই উহা পরম সত্তা হইতে পারে না। ইহা বহু অভিক্ষেপের অন্যতম। এমন কিছু আছে, যাহা ইচ্ছা নয়, কিন্তু ইচ্ছারূপে প্রকাশিত হইতেছে—এ-কথা আমি বুঝিতে পারি; কিন্তু ইচ্ছা নিজেই প্রত্যেক বস্তুরূপে প্রকাশিত হইতেছে—এ-কথা বুঝিতে পারি না; কারণ আমরা দেখিতেছি যে, জগৎ হইতে স্বতন্ত্ররূপে ইচ্ছার কোন ধারণাই আমাদের থাকিতে পারে না। যখন সেই মুক্তিস্বরূপ সত্তা ইচ্ছায় রূপান্তরিত হয়, তখন দেশ কাল ও নিমিত্ত দ্বারা সেই রূপান্তর ঘটে। ক্যান্টের বিশ্লেষণ ধর। ইচ্ছা—দেশ, কাল ও নিমিত্তের মধ্যে আবদ্ধ। তাহা হইলে ইহা কি করিয়া পরম সত্তা হইবে? কালের মধ্যে থাকিয়া ইচ্ছা না করিলে কেহ ইচ্ছা করিতে পারে না।

সমস্ত চিন্তা রুদ্ধ করিতে পারিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আমরা চিন্তার অতীত। নেতি নেতি বিচার করিয়া যখন সব দৃশ্যজগৎকে অস্বীকার করা হয়, তখন যাহা কিছু থাকে,

তাহাই এই পরম সত্তা। ইহাকে প্রকাশ করা যায় না, ইহা অভিব্যক্ত হয় না; কারণ অভিব্যক্তি পুনরায় ইচ্ছায় পরিণত হইবে।

৯. বেদান্তদর্শন এবং খ্রীষ্টধর্ম

[১৯০০ খ্রীঃ, ২৮ ফেব্রুআরী ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত ওকল্যাণ্ডের ইউনিটেরিয়ান চার্চে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ]

পৃথিবীর সব বড় বড় ধর্মের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্যগুলি এতই চমকপ্রদ যে, সময়ে সময়ে মনে হয় বিভিন্ন ধর্মগুলি অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ে বুঝিবা একে অন্যকে অনুকরণ করিয়াছে।

এই অনুকরণের কার্যটি বিভিন্ন ধর্মের ক্ষেত্রেই বর্তমান। কিন্তু এইরূপ একটি দোষারোপ যে ভাসা ভাসা ও বাস্তবানুগ নয়, তাহা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি হইতে পরিস্ফুট হইবেঃ

ধর্ম মানুষের অন্তরের অপরিহার্য অঙ্গ এবং জীবন-মাত্রই অন্তর্জীবনেরই বিবর্তন। ধর্ম প্রয়োজনবশতই বিভিন্ন ব্যক্তি এবং জাতিকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়।

আত্মার ভাষা এক, কিন্তু বিভিন্ন জাতির ভাষা বিভিন্ন; তাহাদের রীতি-নীতি এবং জীবনযাত্রার পদ্ধতির মধ্যেও প্রভেদ অনেক। ধর্ম অন্তরের অভিব্যক্তি এবং ইহা বিভিন্ন জাতি, ভাষা ও রীতি-নীতির মধ্য দিয়া প্রকাশমান। সুতরাং ইহার দ্বারা প্রতীত হয় যে, জগতে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা কেবল প্রকাশগত, ভাবগত নয়। যেমন আত্মার ভাষা ব্যক্তিগত এবং পারিপার্শ্বিক বিভেদ সত্ত্বেও একই হইয়া থাকে, তেমনি বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য এবং একত্ব আত্মারই অন্তর্গত এবং সহজাত। বিভিন্ন যন্ত্রে যেমন ঐক্যতান আছে, তেমনি ধর্মগুলির মধ্যেও সেই একই মিলনের সুর স্পন্দিত।

সব বড় বড় ধর্মের মধ্যেই একটি প্রথম সাদৃশ্য দেখা যায় যে, তাহাদের প্রত্যেকেরই একখানি করিয়া প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থ আছে।

যে-সব ধর্মের এইরূপ কোন গ্রন্থ নাই, তাহারা কালে লোপ পায়। মিশরদেশীয় ধর্মমতগুলির পরিণাম এইরূপই হইয়াছিল। প্রত্যেক বড় ধর্মমতেরই প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থ

যেন উহার ভিত্তিপ্রস্তর, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া সেই মতাবলম্বিগণ সমবেত হয় এবং যাহা হইতে ঐ ধর্মের শক্তি এবং জীবন বিকীর্ণ হয়। আবার প্রতিটি ধর্মই দাবী করে যে, তাহার নিজস্ব শাস্ত্রগ্রন্থই ভগবানের একমাত্র বাণী এবং অন্যান্য শাস্ত্র মিথ্যা ও মানুষের সহজ বিশ্বাসপ্রবণতার উপর বোঝা চাপান এবং অন্য ধর্ম অনুসরণ করা মূর্খতা ও ধর্মান্ধতা।

সকল ধর্মের রক্ষণশীল অংশের বৈশিষ্ট্যই হইল এইপ্রকার গোঁড়ামি। উদাহরণস্বরূপ– বেদের যাহারা গোঁড়া সমর্থক, তাহারা দাবী করে যে, পৃথিবীতে বেদই একমাত্র প্রামাণ্য ঈশ্বরের বাণী এবং ঈশ্বর বেদের মধ্য দিয়াই জগতে তাঁহার বাণী ব্যক্ত করিয়াছেন; শুধু তাহাই নয়, বেদের জন্যই এই জগতের অস্তিত্ব। জগৎ সৃষ্ট হইবার পূর্ব হইতেই বেদ ছিল, জগতের সব-কিছুর অস্তিত্ব বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। বেদে গরুর নাম উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়াই গরুর অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে; অর্থাৎ যে জন্তুকে আমরা গরু বলিয়া জানি, তাহা বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। বেদের ভাষাই ঈশ্বরের আদিম ভাষা; অন্যান্য সব ভাষা আঞ্চলিক বাচন মাত্র, ঈশ্বরের নয়। বেদের প্রতি শব্দ ও বাক্যাংশ শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে হইবে। প্রতি উচ্চারণ-ধ্বনি যথাযথ স্পন্দিত হইবে, এবং এই সুকঠোর যাথার্থ্য হইতে এতটুকু বিচ্যুতিও ঘোরতর পাপ ও ক্ষমার অযোগ্য।

ঠিক এই প্রকার গোঁড়ামি সব ধর্মের রক্ষণশীল অংশেই বর্তমান। কিন্তু আক্ষরিক অর্থ লইয়া এই ধরনের মারামারি যাহারা প্রশ্রয় দেয়, তাহারা মূর্খ এবং ধর্মান্ধ। যাঁহারা যথার্থ ধর্মভাব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বিভিন্ন ধর্মের বহিঃপ্রকাশ লইয়া কখনও বিবাদ করেন না। তাঁহারা জানেন, সব ধর্মের তাৎপর্য এক, সুতরাং কেহ একই ভাষায় কথা না বলিলেও তাঁহারা পরস্পর কোন প্রকার বিবাদ করেন না।

বেদসমূহ বস্তুতই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পুরাতন পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। কেহই জানে না, কোন্ কালে কাহার দ্বারা এগুলি লিখিত হইয়াছে। বেদসমূহ বিভিন্ন খণ্ডে সংরক্ষিত এবং আমার সন্দেহ হয়, কেহ কখনও এইগুলি সম্পূর্ণরূপে পাঠ করিয়াছে কিনা।

বেদের ধর্মই হিন্দুদিগের ধর্ম এবং সব প্রাচ্যদেশীয় ধর্মের ভিত্তিভূমি; অর্থাৎ অন্যান্য প্রাচ্যধর্মগুলি বেদেরই শাখা-প্রশাখা। প্রাচ্যদেশের সব ধর্মমত বেদকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করে।

যীশুখ্রীষ্টের বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাণীগুলির অধিকাংশেরই কোন প্রয়োগ বর্তমানকালে নাই—এরূপ মত পোষণ করা অযৌক্তিক। খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, বিশ্বাসীদের শক্তিলাভ হইবে; খ্রীষ্টের বাণীতে যাহারা বিশ্বাসবান্, তাহাদের কেন শক্তিলাভ হয় না? যদি বল, তাহার কারণ বিশ্বাস এবং পবিত্রতা যথেষ্ট পরিমাণে নাই, তবে তাহা ঠিকই। কিন্তু বর্তমানকালে ঐগুলির কোন প্রয়োগ নাই—এইরূপ বলা হাস্যোদ্দীপক।

আমি কখনও এইরূপ কোন ব্যক্তি দেখি নাই, যে অন্ততঃ আমার সমান নয়। আমি সমগ্র জগৎ পরিভ্রমণ করিয়াছি, নিকৃষ্ট লোকের—নরমাংসভোজীদের সহিতও মিশিয়াছি এবং আমি কখনও এমন একজনকেও দেখি নাই, যে অন্ততঃ আমার সমান নয়। তাহারা যাহা করে, আমি যখন নির্বোধ ছিলাম, আমিও তাহা করিয়াছি। তখন আমি ইহাদের অপেক্ষা উন্নত কিছুই জানিতাম না, এখন আমি বুঝিতেছি। এখন তাহারা ইহা অপেক্ষা ভাল কিছু জানে না, কিছুকাল পরে তাহারাও জানিতে পারিবে। প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে। আমরা সকলেই উন্নতির পথেই চলিয়াছি। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে, একজন অপর ব্যক্তি অপেক্ষা উন্নততর নয়।

১০. বেদান্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম?

[১৯০০ খ্রীঃ, ৮ এপ্রিল সান ফ্রান্সিস্কো শহরে প্রদত্ত]

আপনাদিগের মধ্যে যাঁহারা গত এক মাস যাবৎ আমার প্রদত্ত বক্তৃতাবলী শুনিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই বেদান্ত-দর্শনে নিহিত ভাবগুলির সহিত পরিচিত হইয়াছেন।

বেদান্তই পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম, তবে ইহা কখনও লোকপ্রিয় হইয়াছে—এমন কথা বলা যায় না। অতএব 'বেদান্ত কি ভবিষ্যতের ধর্ম হইতে চলিয়াছে?'—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন।

প্রারম্ভেই আমি বলিতে চাই যে, বেদান্ত জনগণের অধিকাংশের ধর্ম কখনও হইয়া উঠিবে কিনা, তাহা আমি বলিতে পারিব না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রবাসীদের ন্যায় কোন একটি জাতির সকলকে এই ধর্ম আপন কুক্ষিতে আনিতে কখনও কি সক্ষম হইবে? সম্ভবতঃ ইহা হইতে পারে। যাহাই হউক, আজ বিকালে আমরা এই প্রশ্ন লইয়াই আলোচনা করিতে চাই।

প্রথমেই বলি, বেদান্ত কি নয়; পরে বলিব বেদান্ত কি। নৈর্ব্যক্তিক ভাবের উপর জোর দিলেও বেদান্ত কোন কিছুর বিরোধী নয়—যদিও বেদান্ত কাহারও সহিত কোন আপস করে না, বা নিজস্ব মৌলিক সত্য ত্যাগ করে না।

প্রত্যেক ধর্মেই কতকগুলি জিনিষ একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রথম একখানি গ্রন্থ। অদ্ভুত তাহার শক্তি! গ্রন্থখানি যাহাই হউক না কেন, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের সংহতি। গ্রন্থ নাই—এমন কোন ধর্ম আজ টিকিয়া নাই। যুক্তিবাদের বড় বড় কথা সত্ত্বেও মানুষ গ্রন্থ আঁকড়াইয়া রহিয়াছে।

আপনাদের দেশে গ্রন্থবিহীন ধর্ম-স্থাপনের প্রতিটি চেষ্টাই অকৃতকার্য হইয়াছে। ভারতবর্ষে সম্প্রদায়-সকল প্রবল সাফল্যের সহিত গড়িয়া উঠে—কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে সেগুলি লোপ পায়, কারণ তাহাদের কোন গ্রন্থ নাই। অন্যান্য দেশেও এইরূপই হয়।

ইউনিটেরিয়ান ধর্মান্দোলনের উত্থান ও পতন আলোচনা করুন। এই ধর্ম আপনাদের জাতির শ্রেষ্ঠ চিন্তাগুলি উপস্থাপিত করিয়াছে। মেথডিষ্ট, ব্যাপ্টিষ্ট এবং অন্যান্য খ্রীষ্ট্রীয় ধর্মসম্প্রদায়ের মত এই সম্প্রদায় কেন এত প্রচারিত হয় নাই? কারণ উহার কোন গ্রন্থ ছিল না। অপরপক্ষে য়াহুদীদিগের কথা ভাবুন; মুষ্টিমেয় লোকসংখ্যা—এক দেশ হইতে অন্যদেশে বিতাড়িত হইয়াছে—তথাপি নিজেদের গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে, কারণ তাহাদের গ্রন্থ আছে। পারসীদিগের কথা ভাবুন—পৃথিবীতে সংখ্যায় মাত্র একলক্ষ। ভারতে জৈনদিগের দশ লক্ষ অবশিষ্ট আছে। আর আপনারা কি জানেন যে, এই মুষ্টিমেয় পারসী ও জৈনগণ এখনও টিকিয়া আছে, কেবল তাহাদের গ্রন্থের জোরে। বর্তমান সময়ের জীবন্ত ধর্মগুলির প্রত্যেকেরই একটি গ্রন্থ আছে।

ধর্মের দ্বিতীয় প্রয়োজন—একটি ব্যক্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। সেই ব্যক্তি হয় জগতের ঈশ্বররূপে বা মহান্ আচার্যরূপে উপাসিত হইয়া থাকেন। মানুষ একজন মানুষকে পূজা করিবেই। তাহার চাই—একজন অবতার, প্রেরিত পুরুষ বা মহান্ নেতা। সকল ধর্মেই ইহা লক্ষণীয়।

হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের অবতার আছেন; বৌদ্ধ, মুসলমান ও য়াহুদীদের প্রেরিত পুরুষ আছেন। কিন্তু সব ধর্মের এক ব্যাপার—তাহাদের শ্রদ্ধা ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে কেন্দ্র করিয়া নিবিষ্ট।

ধর্মের তৃতীয় প্রয়োজন—নিজেকে শক্ত ও নিরাপদ করিবার জন্য এমন এক বিশ্বাস যে, সেই ধর্মই একমাত্র সত্য; নতুবা ইহা জনসমাজে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

উদারতা শুষ্ক বলিয়া মরিয়া যায়; ইহা মানুষের মনের ধর্মোন্মত্ততা জাগাইতে পারে না—সকলের প্রতি বিদ্বেষ ছড়াইতে পারে না। তাই উদার ধর্মের বারংবার পতন ঘটিয়াছে;

মাত্র কয়েকজনের উপরই ইহার প্রভাব। কারণ নির্ণয় করা খুব কঠিন নয়। উদারতা আমাদের নিঃস্বার্থ হইতে বলে, আমরা তাহা চাই না—কারণ তাহাতে সাক্ষাৎভাবে কোন লাভ নাই; স্বার্থ-দ্বারাই আমাদের বেশী লাভ। যতক্ষণ আমাদের কিছু নাই, ততক্ষণই আমরা উদার। অর্থ ও শক্তি সঞ্চিত হইলেই আমরা রক্ষণশীল। দরিদ্রই গণতান্ত্রিক, সেই আবার ধনী হইলে অভিজাত হয়। ধর্ম-জগতেও মনুষ্য-স্বভাব একইভাবে কাজ করে।

নবী আসিলেন—যাহারা তাঁহাকে অনুসরণ করিল, তাহাদিগকে তিনি কোন এক প্রকারের ফললাভের প্রতিশ্রুতি দিলেন—আর যাহারা অনুসরণ করিল না, তাহাদের জন্য রহিল অনন্ত দুর্গতি। এইভাবে তিনি তাঁহার ভাব প্রচার করেন। প্রচারশীল আধুনিক ধর্মগুলি ভয়ঙ্করভাবে গোঁড়া। যে সম্প্রদায় যত বেশী অন্য সম্প্রদায়কে ঘৃণা করে, তাহার তত বেশী সাফল্য এবং ততই অধিক সংখ্যক মানুষ তাহার অন্তর্ভুক্ত হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান পরিভ্রমণ করিবার পর এবং বহুজাতির সহিত বসবাস করিয়া এবং বর্তমান পৃথিবীর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিবার পর আমার সিদ্ধান্ত—বিশ্বভ্রাতৃত্বের বহু বাগ্‌বিস্তার সত্ত্বেও বর্তমান পরিস্থিতিই চলিতে থাকিবে। বেদান্ত এই-সকল শিক্ষার একটিতেও বিশ্বাস করে না। প্রথমতঃ ইহা কোন পুস্তকে বিশ্বাস করে না। প্রবর্তকের পক্ষে ইহা খুবই কঠিন। অপর কোন গ্রন্থের উপর কোন গ্রন্থের প্রামাণ্য বা কর্তৃত্ব বেদান্ত স্বীকার করে না। ঈশ্বর, আত্মা ও চরমতত্ত্ব সম্বন্ধে সব সত্যই একখানি মাত্র গ্রন্থেই থাকিতে পারে—বেদান্ত একথা দৃঢ়কণ্ঠে অস্বীকার করে। যাঁহারা উপনিষদ্ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, উপনিষদই বারংবার বলিতেছে, 'শুধু পড়িয়া শুনিয়া কেহ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না।' দ্বিতীয়তঃ একজন বিশেষ ব্যক্তিকে (শ্রেষ্ঠ) ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করা—বেদান্তমতে আরও কঠিন। বেদান্ত বলিতে উপনিষদই বুঝায়; একমাত্র উপনিষদই কোন ব্যক্তিবিশেষে আসক্ত নয়।

কোন একজন পুরুষ বা নারী কখনই বেদান্তবাদীর কাছে পূজার্হ হইয়া উঠেন নাই, তাহা হইতে পারে না। একজন মানুষ একটি পাখী বা কীট অপেক্ষা বেশী পূজার যোগ্য নয়, আমরা সকলেই ভাই, পার্থক্য কেবল মাত্রায়। আমি যাহা, নিম্নতম কীটও তো তাহা।

বুঝিয়া দেখুন, কোন মানুষ আমাদিগের অনেক ঊর্ধ্বে উঠিবেন, আর আমরা গিয়া তাঁহাকে পূজা করিব—তিনি আমাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইবেন—আর আমরা তাঁহার কৃপায় উদ্ধার পাইব—এই-সকল ভাবের স্থান বেদান্তে খুবই কম। বেদান্ত এরূপ শিখায় না—না গ্রন্থ, না কোন মানুষকে পূজা করিতে; না, এই-সকল কিছুই শিখায় না।

ঈশ্বরবিষয়ক সমস্যাটি আরও জটিল। আপনারা এই দেশে সাধারণতন্ত্র চান। বেদান্ত সাধারণতন্ত্রী ঈশ্বরকেই প্রচার করে।

আপনাদের দেশে সরকার আছে—সরকার একটি নৈর্ব্যক্তিক সত্তা। আপনাদের সরকার স্বৈরাচারতন্ত্রী নয়, তথাপি পৃথিবীর যে-কোন রাজতন্ত্র অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। মনে হয়, কেহই এই কথাটি বুঝিতে পারে না যে, সত্যিকারের শক্তি, সত্যিকারের জীবন, সত্যিকারের ক্ষমতা অদৃশ্য, নিরাকার, নৈর্ব্যক্তিক সত্তায় নিহিত। ব্যক্তি হিসাবে—অন্য সব-কিছু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে মানুষ নগণ্যমাত্র, কিন্তু যে জাতিটি নিজেই নিজের শাসন করিয়া থাকে, উহার অন্তর্গত নৈর্ব্যক্তিক সত্তাবিশেষ হিসাবে আপনার শক্তি অসীম। সরকারের সহিত মিলিয়া মিশিয়া আপনারা অভিন্ন—আপনারা এক ভীষণ শক্তি। কিন্তু বস্তুতঃ শক্তিটি কোথায় নিহিত? প্রত্যেক মানবই সেই শক্তি। রাজা তো আত্মাতে নাই। আমি সকল মানুষকে সমভাবে একই দেখি। আমাকে কাহারও নিকট টুপি খুলিতে বা মাথা নত করিতে হইবে না। তথাপি প্রতি মানুষের মধ্যেই এই ভীষণ শক্তি। বেদান্ত ঠিক এইরূপ।

বেদান্তের ঈশ্বর সম্পূর্ণ পৃথক্ এক জগতে সিংহাসনে সমাসীন সম্রাট্ নন! অনেকে আছে, তাহাদের ঐরূপ একজন ঈশ্বর চাই, যাঁহাকে তাহারা ভয় করিবে, যাঁহাকে তাহারা সন্তুষ্ট করিবে। তাহারা প্রদীপ জ্বালাইবে এবং তাঁহার সম্মুখে ধুলায় গড়াগড়ি যাইবে। তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য তাহাদের একজন রাজা চাই, স্বর্গেও তাহাদের সকলের উপর শাসন করিবার জন্য রাজা চাই। অন্ততঃ এই দেশ হইতে রাজা বিদায় হইয়াছেন। স্বর্গস্থ রাজা আজ কোথায়? মর্ত্যের রাজারা যেখানে, সেইখানেই। গণতান্ত্রিক দেশে রাজা প্রত্যেক প্রজার অন্তরে। এই দেশে আপনারা সকলেই রাজা। বেদান্ত ধর্মেও তাই ঈশ্বর

প্রত্যেকের ভিতরে। বেদান্ত বলে, জীব ব্রহ্মই। এইজন্য বেদান্ত খুব কঠিন। বেদান্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে পুরাতন ধারণা আদৌ শিক্ষা দেয় না। মেঘের ওপারে অবস্থিত স্বেচ্ছাচারী, শূন্য হইতে খুশীমত সৃষ্টিকারী, মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণাদায়ক এক ঈশ্বরের পরিবর্তে বেদান্ত শিক্ষা দেয়—ঈশ্বর প্রত্যেকের অন্তরে অন্তর্যামী, ঈশ্বর সর্বরূপে—সর্বভূতে। এই দেশ হইতে মহিমান্বিত রাজা বিদায় লইয়াছেন, স্বর্গস্থ রাজ্যপাট বেদান্ত হইতে শত শত বৎসর পূর্বেই লোপ পাইয়াছে।

ভারত মহিমান্বিত একজন রাজাকে চায়, ঐভাব ত্যাগ করিতে পারিতেছে না—এই কারণেই বেদান্ত ভারতের ধর্ম হইতে পারে না। বেদান্ত আপনাদের দেশের ধর্ম হইতে পারে—সে সম্ভাবনা আছে, কারণ ইহা সাধারণতন্ত্র। কিন্তু তাহা হইতে পারে কেবলমাত্র তখনই, যখন আপনারা পরিষ্কারভাবে বেদান্ত বুঝিয়া লইতে পারিবেন। যদি আপনারা সত্যিকারের নর-নারী হইতে পারেন—অর্ধজীর্ণ-ভাবধারা-সম্পন্ন ও কুসংস্কারপূর্ণ-বুদ্ধিবিশিষ্ট মানুষ না হন, যদি আপনারা সত্যিকারের ধার্মিক হইতে চান তবেই ইহা সম্ভব, কারণ বেদান্ত কেবল আধ্যাত্মিক-ভাবের সহিতই সংশ্লিষ্ট।

স্বর্গস্থ ঈশ্বরের ধারণা কি রকম? নিছক জড়বাদ! ঈশ্বর নামক যে অনন্ত তত্ত্ব আমাদের সকলের মধ্যে রূপায়িত হইয়াছেন, তিনিই বেদান্তের প্রতিপাদ্য। মেঘের উপরে ঈশ্বর বসিয়া আছেন! ভাবুন দেখি কী অধর্মের কথা! ইহাই জড়বাদ, জঘন্য জড়বাদ! শিশুরা যখন এই প্রকার ভাবে, তখন ইহা ঠিক হইতে পারে; কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিরা যখন এই প্রকার শিক্ষা দেয়, তখন ইহা দারুণ বিরক্তিকর। এই ধারণা—জড় হইতে, দেহভাব হইতে, ইন্দ্রিয়ভাব হইতে উদ্ভূত। ইহা কি ধর্ম? ইহা আফ্রিকার 'মাম্বো ফাম্বো' ধর্ম অপেক্ষা কোন অংশে উন্নত নয়। ঈশ্বর আত্মা; তিনি সত্যস্বরূপে উপাস্য। আত্মা কি শুধু স্বর্গেই থাকে? আত্মা কি? আমরাই আত্মা। আমরা তাহা অনুভব করি না কেন? কিরূপে তুমি আত্মা হইতে ভিন্ন হইলে? দেহ ভিন্ন আর কিছুই ইহার কারণ নহে। দেহভাব ভুলিলেই সর্বত্র আত্মভাব অনুভূত হয়।

বেদান্ত এই-সব মতবাদ প্রচার করে নাই। কোন পুস্তক নয়; বেদান্তে মনুষ্যসমাজ হইতে কোন ব্যক্তিকে বিশেষ করিয়া বাছিয়া লইতে হয় না। 'তোমরা কীট, আর আমরা ঈশ্বর–প্রভু!'—না, এই-সব কিছুই ইহাতে নাই। যদি তুমি ঈশ্বর, তবে আমিও ঈশ্বর। সুতরাং বেদান্ত পাপ স্বীকার করে না। ভ্রম আছে, পাপ নাই; কালক্রমে সকলেই সত্যে উপনীত হইবে। শয়তান নাই—এই ধরনের কল্পনামূলক গল্পের কোনটির অস্তিত্ব নাই। বেদান্ত কেবল একটি পাপকে—জগতের মধ্যে কেবল একটিকেই স্বীকার করে, তাহা এইঃ 'অপরকে বা নিজেকে পাপী ভাবাই পাপ।' এই ধারণা হইতে অপরাপর ভ্রম-প্রমাদ যাহাকে সাধারণতঃ পাপ বলা হয়, তাহা ঘটিয়া থাকে। আমাদের জীবনে অনেক ত্রুটি ঘটিয়াছে, কিন্তু আমরা অগ্রসর হইতেছি। আমরা ভুল যে করিতে পারিয়াছি, এজন্য আমাদের জয় হউক। দূরদৃষ্টিতে অতীতের দিকে চাহিয়া দেখুন। যদি বর্তমান অবস্থা মঙ্গলজনক হইয়া থাকে, তবে তাহা অতীতের সকল বিফলতা ও সাফল্যের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে। সাফল্যের জয় হউক! ব্যর্থতারও জয় হউক! যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া তাকাইও না। অগ্রসর হও। দেখা যাইতেছে, বেদান্ত পাপ বা পাপী কল্পনা করে না। ভয় করিতে হইবে—এমন ঈশ্বর এখানে নাই। ঈশ্বরকে আমরা কখনও ভয় করিতে পারি না, কারণ তিনি আমাদের আত্মা-স্বরূপ। তাহা হইলে যাহার ঈশ্বরে ভয় আছে, তিনিই কি সর্বাপেক্ষা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি নন? এমন লোকও থাকিতে পারেন, যিনি আপনার ছায়া দেখিয়া ভয় পান, কিন্তু তেমন ব্যক্তিও নিজেকে ভয় পান না। মানুষের নিজের আত্মাই ভগবান্। তিনিই একমাত্র সত্তা, যাহাকে সম্ভবতঃ কখনই ভয় করা যায় না। কি বাজে কথা যে, 'ঈশ্বরের ভয় তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহাকে ভীত করিল', ইত্যাদি, ইত্যাদি—কি পাগলামি? ভগবান্ আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন, পাগলা-গারদে যেন আমাদের সকলকেই বাস করিতে না হয়। কিন্তু যদি আমাদিগের অধিকাংশই পাগল না হই, তবে 'ভগবান্‌কে ভয় করা' ইত্যাদি মিথ্যা বিষয় রচনা করি কেমন করিয়া? ভগবান্ বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন যে, কম-বেশী সমগ্র মনুষ্যজাতিই পাগল। মনে হইতেছে, কথাটি সম্পূর্ণ সত্য।

কোন গ্রন্থ নয়, ব্যক্তি নয়, সগুণ ঈশ্বর নয়। এইগুলি দূর করিতে হইবে, ইন্দ্রিয়চেতনাও দূর হইবে। আমরা ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ থাকিতে পারি না। হিমবাহে তুহিন-স্পর্শে মুমূর্ষু ব্যক্তির মত এখন আমরা আবদ্ধ হইয়া আছি। শীতে অবসন্ন পথিক ঘুমাইয়া থাকার জন্য একপ্রকার প্রবল আকাঙ্ক্ষা বোধ করে এবং তাহাদের বন্ধুগণ যখন তাহাকে জাগাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে, তাহাকে মৃত্যু সম্পর্কে সাবধান করে, তখন সে যেমন বলিয়া থাকে, 'আমাকে মরিতে দাও, আমি ঘুমাইতে চাই'—তেমনি আমরা সকলেই ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়ের বিষয় আঁকড়াইয়া আছি, এমন কি আমরা ইহাতে বিনষ্ট হইয়া গেলেও আঁকড়াইয়া থাকি—আমরা ভুলিয়া যাই যে, ইহা অপেক্ষাও মহত্তর ভাব আছে।

হিন্দুদিগের পৌরাণিক কাহিনীতে বর্ণিত আছে যে, ভগবান্ একবার মর্ত্যে শূকররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শূকরীর গর্ভে কালক্রমে তাঁহার অনেকগুলি ছোট ছোট শাবক হইয়াছিল। তিনি তাঁহার এই পরিবারটিতেই খুব সুখী; তাঁহার স্বর্গীয় মহিমা ও ঈশ্বরত্ব ভুলিয়া গিয়া এই পরিবারের সহিত কাদায় মহানন্দে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেবগণ মহা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং মর্ত্যে তাঁহার নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিলেন, যাহাতে তিনি শূকর-শরীর ছাড়িয়া স্বর্গে গমন করেন। কিন্তু ভগবান্ ঐ-সকল কিছুই করিলেন না—তিনি দেবগণকে তাড়াইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, তিনি খুব সুখে আছেন এবং ইহাতে যেন কোন বাধা উপস্থিত না হয়। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া দেবগণ ঈশ্বরের শূকর-শরীরটি ধ্বংস করিয়া দিতেই তিনি তাঁহার স্বর্গীয় মহিমা ফিরিয়া পাইলেন এবং শূকর-যোনিতেও যে তিনি এত আনন্দ পাইতে পারেন—ইহা ভাবিয়া অতিশয় আশ্চর্য হইলেন।

ইহাই মানুষের স্বভাব। যখনই তাহারা নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরের কথা শোনে, তাহারা ভাবে, 'আমার ব্যক্তিত্বের কী হইবে?—আমার ব্যক্তিত্ব যে নষ্ট হইবে!' আবার কখনও মনে ঐরূপ চিন্তা আসিলে শূকরটির কথা স্মরণ করিবে এবং তাহার পরে ভাবিবে, কী অসীম সুখের খনি না তোমার মধ্যে, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে রহিয়াছে। বর্তমান অবস্থাতে আপনি কতই না সুখী! কিন্তু যখন মানুষ সত্যস্বরূপ জানিতে পারে, তখন সে এই ভাবিয়া অবাক

হয় যে, সে এই ইন্দ্রিয়পর জীবন ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক ছিল। ব্যক্তিত্বে কী আছে? ইহা কি শূকর জীবন হইতে ভাল কিছু? আর তাহাই ছাড়িতে চায় না! ভগবান্ আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন।

বেদান্ত আমাদিগকে কি শিক্ষা দেয়? প্রথমতঃ বেদান্ত শিখায় যে, সত্য জানিতে হইলে মানুষকে নিজের বাহিরে কোথাও যাইবার প্রয়োজন নাই। ভূত, ভবিষ্যৎ সব বর্তমানেই নিহিত। কোন মানুষই কখনও অতীতকে দেখে নাই। আপনাদের কেহ কি অতীতকে দেখিয়াছেন? যখন কেহ অতীতকে বোধ করিতেছি বলিয়া চিন্তা করে, তখন সে বর্তমান মুহূর্তমধ্যে অতীতের কল্পনা করে মাত্র। ভবিষ্যৎ দেখিতে গেলে বর্তমানের মধ্যেই তাহাকে আনিতে হইবে, বর্তমানই একমাত্র সত্য—বাকী সব কল্পনা। এই বর্তমান, ইহাই সব। কেবল একই বর্তমান। যাহা কিছু বর্তমানে অবস্থিত, তাহাই সত্য। অনন্তকালের মধ্যে একটি ক্ষণ—অন্যান্য প্রত্যেক ক্ষণের মতই সম্পূর্ণ ও সর্বগ্রাহী। যাহা কিছু আছে, ছিল ও থাকিবে—তাহা সবই বর্তমানে অবস্থিত। যদি কেহ ইহার বাহিরে কোন কিছুর কল্পনা করিতে চান, করুন—কিন্তু কখনই সফলকাম হইবেন না।

এই পৃথিবীর সাদৃশ্য বাদ দিয়া কোন্ ধর্ম স্বর্গ-চিত্রের বর্ণনা দিতে পারিয়াছে? আর সবই তো চিত্র—কেবল এই জগৎ-চিত্রটি আমাদিগের নিকট ধীরে ধীরে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা জগৎকে স্থূল, এবং বর্ণ-আকৃতি-শব্দাদি সম্পন্ন আছে বলিয়া দেখিতেছি। মনে করুন, আমার একটি বৈদ্যুতিক ইন্দ্রিয় হইল—তখন সব পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। মনে করুন, আমার ইন্দ্রিয়গুলি সূক্ষ্মতর হইয়া গেল—তখন আপনারা সকলেই অন্যরূপে প্রতিভাত হইবেন। যদি আমি পরিবর্তিত হই, তবে আপনারা পরিবর্তিত হইয়া যান। যদি আমি ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে চলিয়া যাই, আপনারা আত্মারূপে—ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হইবেন। বস্তুগুলিকে যেমন দেখা যাইতেছে, তাহারা ঠিক তেমনটি নয়।

ক্রমে ক্রমে যখন এইগুলি আমরা বুঝিব, তখন ধারণা হইবেঃ এই সব স্বর্গাদি লোক—সব-কিছু—সব এইখানে, এইক্ষণেই অবস্থিত; আর এইগুলি সত্য সত্য ঈশ্বরাস্তিত্বের উপর

আরোপিত বা অধ্যস্ত সত্তা ব্যতীত কিছুই নয়। এই অস্তিত্ব স্বর্গ-মর্ত্যাদি অপেক্ষা মহত্তর। মানুষ ভাবে, মর্ত্যলোক পাপময় এবং স্বর্গ অন্য কোথাও অবস্থিত। মর্ত্যলোক খারাপ নয়। জানিতে পারিলে দেখা যায় যে, ইহাও ভগবান্ স্বয়ং। বিশ্বাস করা অপেক্ষা এই তত্ত্বকে বোঝা অনেক বেশী দুরূহ। আততায়ী, যে আগামীকাল ফাঁসিতে ঝুলিবে, সেও ভগবান্, সাক্ষাৎ ভগবান্। নিশ্চিতভাবে এই তত্ত্বকে ধারণা করা খুবই কঠিন, কিন্তু ইহাকে উপলব্ধি করা যায়।

এইজন্য বেদান্তের সিদ্ধান্ত—বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব নয়, বিশ্বাত্মার ঐক্য। আমি অপরাপর মানুষ, জন্তু—ভাল, মন্দ—যে-কোন জিনিষের সঙ্গেই অভিন্ন। সর্বত্র এক শরীর, এক মন ও একটি আত্মা বিরাজিত। আত্মা কখনও মরে না। মৃত্যু বলিয়া কোথাও কিছু নাই—দেহের ক্ষেত্রেও মরণ নাই, মনও মরে না। শরীরেরই বা মৃত্যু কিরূপে ঘটিতে পারে? একটি পাতা খসিয়া পড়িল—ইহাতে কি গাছের মৃত্যু ঘটে? এই বিশ্ব আমার শরীর। দেখুন, কিভাবে ইহা অনন্তকাল ধরিয়া আছে। সকল মনই আমার। সকল পায়ে আমি পরিভ্রমণ করি—সকল মুখে আমিই কথা বলি—সর্বশরীরে আমিই অধিষ্ঠিত।

কেন আমি ইহা অনুভব করিতে পারি না? কারণ আমার ব্যক্তিত্ব—ঐ শূকরত্ব। মানুষ নিজেকে এই মনের সহিত বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, এইজন্য কেবল এইখানেই থাকিতে পারে—দূরে নয়। অমরত্ব কি? সামান্য কয়েকজন মাত্র জবাবটি এইভাবে দেয়, 'ইহা যে আমাদেরই অস্তিত্ব!' বেশীর ভাগ লোকই ভাবে, এই সবই মরণশীল বা মৃত—ভগবান্ এইখানে নাই, তাহারা মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়া অমর হইবে। তাহারা কল্পনা করে যে, মৃত্যুর পর তাহারা ভগবানের দর্শন পাইবে। কিন্তু যদি তাহারা তাঁহাকে এই লোকে এইক্ষণে দেখিতে না পায়—তবে মৃত্যুর পরও তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না। যদিও তাহারা সকলেই অমরত্বে বিশ্বাসী, তথাপি তাহারা জানে না—মরিবার পর স্বর্গে গিয়া অমরত্ব লাভ করা যায় না, পরন্তু আমাদের শূকরসুলভ ব্যক্তিত্ব ত্যাগ করিয়া—একটি ক্ষুদ্র শরীরের সহিত নিজেকে আবদ্ধ না রাখিয়াই আমরা অমরত্ব লাভ করিতে পারি। নিজেকে সকলের সহিত এক বলিয়া জানা—সকল দেহের মধ্যেই আপনার অধিষ্ঠান উপলব্ধি করা—সকল

মনের মধ্য দিয়া অনুভব করাই অমরত্ব। আমরা এই শরীর ছাড়া অপর শরীরের মধ্য দিয়াও অনুভূতি লাভ করিতে পারি; আমাদিগকে অপর শরীরের মধ্য দিয়াও অনুভূতি লাভ করিতেই হইবে। সমবেদনার অর্থ কি? এই সমবেদনার–শরীর মধ্যে এই অনুভূতির–কি কোন সীমা আছে? ইহাও সম্পূর্ণরূপে সম্ভব যে, এমন এক সময় আসিবে, যখন সমগ্র বিশ্বের মধ্য দিয়া আমি অনুভব করিব।

ইহাতে লাভ কি? এই শূকর-শরীর ত্যাগ করা কঠিন; আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শূকর-শরীরের আনন্দ ত্যাগ করিতে দুঃখবোধ করিয়া থাকি। বেদান্ত ইহা ত্যাগ করিতে বলে না, বলে–'ইহার পরে যাও।' কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন নাই–দুইটি শরীরে অনুভূত সুখলাভ অধিকতর ভাল–তিনটিতে আরও বেশী ভাল। একটির বদলে বহু শরীরে বাস! যখন আমি বিশ্বের মাধ্যমে সুখলাভ করিতে পারিব, তখন সমগ্র বিশ্বই আমার শরীর হইবে।

অনেকে আছেন, যাঁহারা এই-সকল তত্ত্ব শুনিয়া ভীত হন। তাঁহারা যে পরপীড়নকারী কোন ঈশ্বরের সৃষ্ট ক্ষুদ্র শূকর দেহমাত্র নন–এই কথা শুনিতে তাঁহারা রাজী নন। আমি তাঁহাদিগকে বলি, 'অগ্রসর হউন!' তাঁহারা বলেন–তাঁহারা পাপের পঙ্কে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং কাহারও কৃপা ব্যতীত তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারেন না। আমি বলি, 'তোমরাই ঈশ্বর!' তাঁহারা জবাবে বলেন, 'ওহে ঈশ্বরদ্বেষী! তুমি কোন্ সাহসে এই কথা বল? কিভাবে একটি দীন প্রাণী (জীব) ঈশ্বর হয়? আমরা পাপী!' আপনারা জানেন, সময়ে সময়ে আমি বড় হতোদ্যম হইয়া পড়ি। শত শত পুরুষ ও মহিলা আমাকে বলিয়াছেন, 'যদি নরকই নাই, তবে ধর্ম কিভাবে থাকে?' যদি এই-সব মানুষ স্বেচ্ছায় নরকে যায়, তবে কে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারে?

মানুষ যাহা কিছুর স্বপ্ন দেখে বা ভাবে–সবই তাহার সৃষ্টি। যদি নরকের চিন্তা করিয়া মরে, তবে নরকই দেখিবে। যদি মন্দ এবং শয়তানের চিন্তা করে, তবে শয়তানকেই পাইবে–ভূত ভাবিলে ভূত পাইবে। যাহা কিছু ভাবনা করিবেন, তাহাই হইবেন, এইজন্য সৎ ও মহৎ ভাবনা অবশ্যই ভাবিতে হইবে। ইহার দ্বারাই নিরূপিত হয় যে, মানুষ একটি ক্ষীণ ক্ষুদ্র কীটমাত্র। আমরা দুর্বল–এই কথা উচ্চারণ করিয়াই আমরা দুর্বল হইয়া পড়ি, ইহা

অপেক্ষা বেশী ভাল কিছু হইতে পারি না। মনে কর, আমরা নিজেরাই আলো নিবাইয়া, জানালা বন্ধ করিয়া চীৎকার করি—ঘরটি অন্ধকার। ঐ সকল আহাম্মকির কথা ভাবুন! 'আমি পাপী'—এই কথা বলিলে আমার কী উপকার হইবে? যদি আমি অন্ধকারেই থাকি, তবে আমাকে একটি প্রদীপ জ্বালিতে দাও; তাহা হইলে সকল অন্ধকার চলিয়া যাইবে। আর মানুষের স্বভাব কী আশ্চর্যজনক। যদিও তাহারা সর্বদাই সচেতন যে, তাহাদের জীবনের পিছনে বিশ্বাত্মা বিরাজিত, তথাপি তাহারা বেশী করিয়া শয়তানের কথা—অন্ধকার ও মিথ্যার কথা ভাবিয়া থাকে। তাহাদের সত্যস্বরূপের কথা বলুন—তাহারা বুঝিতে পারিবে না; তাহারা অন্ধকারকে বেশী ভালবাসে।

ইহা হইতেই বেদান্তে একটি মহৎ প্রশ্নের সৃষ্টি হইয়াছেঃ জীব এত ভীত কেন? ইহার উত্তর এই যে, জীবগণ নিজেদের অসহায় ও অপরের উপর নির্ভরশীল করিয়াছে বলিয়া। আমরা এত অলস যে, নিজেরা কিছুই করিতে চাই না। আমরা একটি ইষ্ট, একজন পরিত্রাতা, অথবা একজন প্রেরিত পুরুষ চাই, যিনি আমাদের জন্য সব-কিছু করিয়া দিবেন। অতিরিক্ত ধনী কখনও হাঁটেন না—সর্বদাই গাড়ীতে চলেন; বহু বৎসর বাদে তিনি হঠাৎ একদিন জাগিলেন, কিন্তু তখন তিনি অথর্ব হইয়া গিয়াছেন। তখন তিনি বোধ করিতে আরম্ভ করেন, যে ভাবে তিনি সারা জীবন কাটাইয়াছেন, তাহা মোটের উপর ভাল নয়, কোন মানুষই আমার হইয়া হাঁটিতে পারে না। আমার হইয়া যদি কেহ প্রতিটি কাজ করে, তবে সে প্রতিবারই আমাকে পঙ্গু করিবে। যদি কাহারও সব কাজই অপরে করিয়া দেয়, তবে সে অঙ্গচালনার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিবে। যাহা কিছু আমরা স্বয়ং করি, তাহাই একমাত্র কাজ যাহা আমাদিগের নিজস্ব। যাহা কিছু আমাদের জন্য অপরের দ্বারা কৃত হয়, তাহা কখনই আমাদের হয় না। তোমরা আমার বক্তৃতা শুনিয়া আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করিতে পার না। যদি তোমরা কিছুমাত্র শিখিয়া থাক, তবে আমি সেই স্ফুলিঙ্গ-মাত্র, যাহা তোমাদের ভিতরকার অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। অবতার পুরুষ বা গুরু কেবল ইহাই করিতে পারেন। সাহায্যের জন্য ছুটাছুটি মূর্খতা।

ভারতে বলদ-বাহিত শকটের কথা আপনারা জানেন। সাধারণতঃ দুইটি বলদকে গাড়ীর সহিত জুড়িয়া দেওয়া হয়, আর কখনও কখনও এক আঁটি খড় একটি বাঁশের মাথায় বাঁধিয়া পশুদুইটির সামনে কিঞ্চিৎ দূরে—কিন্তু উহাদের নাগালের বাহিরে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। বলদ দুইটি ক্রমাগত খড় খাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু কখনও কৃতকার্য হইতে পারে না। ঠিক এইভাবেই আমরা সাহায্য লাভ করি। আমরা মনে করি—আমরা নিরাপত্তা, শক্তি, জ্ঞান, শান্তি বাহির হইতে পাইব। আমরা সর্বদাই এইরূপ আশা করি, কিন্তু কখনও আশা পূর্ণ করিতে পারি না। বাহির হইতে কোন সাহায্য কখনও আসে না।

মানুষের কোন সহায়ক নাই। কেহ কোন কালে ছিল না, নাই এবং থাকিবেও না। কেনই বা থাকিবে? আপনারা কি মানব বা মানবী নন? এই পৃথিবীর প্রভুগণ কি অপরের কৃত সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হইবে? ইহাতে কি আপনারা লজ্জিত নন? যখন আপনারা ধুলায় মিশিয়া যাইবেন, তখনই অপরের সহায়তা লাভ করিবেন। কিন্তু মানুষ আত্মস্বরূপ। নিজেদের বিপদ হইতে টানিয়া তোল! ‘উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্’। ইহা ছাড়া অন্য কোন সাহায্য নাই—কোনকালে ছিলও না। সহায়ক আছে, এরূপ ভাবনা সুমধুর ভ্রান্তিমাত্র। ইহার দ্বারা কোন মঙ্গল হইবে না। একদিন একজন খ্রীষ্টান আমার কাছে আসিয়া বলে, ‘আপনি একজন ভয়ঙ্কর পাপী।’ উত্তরে বলিলাম—‘হ্যাঁ, তাই, তারপর?’ সে একজন ধর্মপ্রচারক। লোকটি আমাকে ছাড়িতে চাহিত না। তাহাকে আসিতে দেখিলেই আমি পলায়ন করিতাম। সে বলিত, ‘তোমার জন্য আমার অনেক ভাল ভাল জিনিষ আছে। তুমি একটি পাপী, আর তুমি নরকে যাবে।’ আমি জবাবে বলিতাম, ‘খুব ভাল—আর কিছু?’ আমি প্রশ্ন করিলাম, ‘আপনি যাচ্ছেন কোথায়?’ সে উত্তর দিল, ‘আমি স্বর্গে যাচ্ছি।’ আমি বলিলাম, ‘আমি তাহলে নরকেই যাব।’ সেই দিন হইতে সে আমাকে নিষ্কৃতি দেয়।

এইখানে কোন খ্রীষ্টান আসিলে বলিবে, ‘তোমরা সকলেই মরিতে বসিয়াছ। কিন্তু যদি তোমরা আমাদের মতবাদে বিশ্বাস কর, তবে খ্রীষ্ট তোমাদের মুক্ত করিবেন।’ যদি ইহা সত্য হইত—কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই কুসংস্কার ভিন্ন অন্য কিছুই নয়—তাহা হইলে খ্রীষ্টান দেশগুলিতে কোন অন্যায় থাকিত না। ‘এস, আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করি, বিশ্বাস

করিতে কোন খরচ লাগে না।’ কিন্তু কেন? ইহাতে কোন লাভও হয় না! যদি আমি জিজ্ঞাসা করি, ‘এখানে এত অধিক লোক দুষ্ট কেন?’ তাঁহারা বলেন, ‘আমাদিগকে আরও খাটিতে হইবে।’ (তার মানে) ‘ভগবানে বিশ্বাস রাখ, কিন্তু তল্পী ঠিক রাখ।’ ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর এবং ভগবান্ আসিয়া সাহায্য করুন। কিন্তু আমিই তো সংগ্রাম, প্রার্থনা এবং পূজা করি; আমিই তো আমার সমস্যা-সকল মিটাইয়া লই—আর ভগবান্ লন তাঁহার কৃতিত্ব। ইহা তো ভাল নয়। আমি কখনও তাহা করি না।

একবার আমি এক ভোজসভায় আমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। গৃহকর্ত্রী আমাকে প্রার্থনা করিতে বলিলেন। আমি বলিলাম, ‘আমি অবশ্যই আপনার কল্যাণ কামনা করব, মহাশয়া।—আপনি আমার শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানুন।’ আমি যখন কাজ করি, আমি আমার প্রতিই কর্তব্য করি, যেহেতু আমি কঠোর পরিশ্রম করিয়াছি, এবং বর্তমানে যাহা আমার আছে, তাহা সবই উপার্জন করিয়াছি—সেহেতু আমি ধন্য।

তুমিই তো সর্বদা কঠোর পরিশ্রম করিতেছ, অথচ ধন্যবাদ জানাইতেছ অপরকে, কারণ তুমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তুমি ভীত। হাজার বছরের পুঞ্জীভূত এই-সব কুসংস্কার চিরতরে ঝাড়িয়া ফেল। ধার্মিক হওয়া একটু কঠোর সাধনাসাপেক্ষ। সকল কুসংস্কারই জড়বাদ-প্রসূত, কারণ সেইগুলি কেবল দেহজ্ঞানের উপরই প্রতিষ্ঠিত। আত্মার কোন কুসংস্কার নাই—ইহা শরীরের বৃথা বাসনা হইতে বহু ঊর্ধ্বে।

কিন্তু এই বৃথা বাসনাগুলি এখানে সেখানে—এমন কি অধ্যাত্ম-রাজ্যেও প্রতিভাত। আমি কতকগুলি প্রেততত্ত্বের সভায় যোগদান করিয়াছি। একটিতে নায়িকা ছিলেন একজন মহিলা। তিনি আমাকে বলিলেন, ‘আপনার মা ও ঠাকুরদা আমার কাছে আসেন।’ তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা মহিলাটিকে নমস্কার জানাইয়াছেন ও তাঁহার সহিত কথা কহিয়াছেন। কিন্তু আমার মা এখনও জীবিত! মানুষ এই কথা ভাবিতে ভালবাসে যে, মৃত্যুর পরে তাহাদের আত্মীয়পরিজন এই দেহের আকারেই বর্তমান থাকে, আর প্রেততাত্ত্বিকগণ তাহাদের কুসংস্কারগুলিকে লইয়া খেলায়। এই কথা জানিলে আমি দুঃখিতই হইব যে, আমার মৃত পিতা এখনও তাঁহার নোংরা দেহটি পরিধান করিয়া অছেন।

পিতৃপুরুষগণ এখনও জড়বস্তুতে আবদ্ধ আছেন, এই কথা জানিতে পারিলে সাধারণ মানুষ সান্ত্বনা পায়। অপর একস্থলে যীশুকে আমার সামনে আনা হইয়াছিল। আমি বলিলাম, 'ভগবান্, আপনার কুশল তো?' এই সব ব্যাপারে আমি হতাশ বোধ করি। যদি সেই মহান্ ঋষিপুরুষ অদ্যাপি ঐ শরীর ধারণ করিয়া থাকেন, তবে আমাদের—দীন প্রাণীদের ভাগ্যে না জানি কী আছে! প্রেততাত্ত্বিকগণ আমাকে ঐ-সকল পুরুষদের কাহাকেও স্পর্শ করিবার অনুমতি দেন নাই। যদি এই-সব সত্যও হয়—তবু আমি ঐ-সকল চাহি না। আমি ভাবিঃ সাধারণ মানুষ সত্যি নাস্তিক!—কেবল পঞ্চইন্দ্রিয়ের ভোগস্পৃহা! বর্তমানে যাহা আছে, তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া মৃত্যুর পরও তাহারা এই জিনিষই বেশী করিয়া চায়!

বেদান্তের ঈশ্বর কি? তিনি একটি তত্ত্বস্বরূপ, ব্যক্তি নন। তুমি, আমি সকলেই ব্যষ্টি- ঈশ্বর। এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা যে পরম-ঈশ্বর, তিনি একটি নৈর্ব্যক্তিক সত্তা। তুমি এবং আমি, বেড়াল, ইঁদুর, শয়তান, ভূত—এই-সবই তাঁহার ব্যষ্টি-সত্তা—সকলেই ব্যক্তি-ঈশ্বর। তুমি ব্যষ্টিভাবাপন্ন ঈশ্বরকে পূজা করিতে চাও; উহা তোমার স্বরূপকেই পূজা করা। যদি তোমরা আমার উপদেশ গ্রহণ কর, তবে কখনও কোন গীর্জায় যাইও না। বাহিরে এস, যাও নিজেকে ধৌত কর। যুগ যুগ ধরিয়া যে কুসংস্কার তোমাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, যতক্ষণ না তাহা পরিষ্কৃত হইতেছে, ততক্ষণ বারে বারে নিজেকে ধৌত কর। অথবা সম্ভবতঃ তোমরা তাহা করিতে চাও না—কারণ এদেশে তোমরা ঘন ঘন স্নান কর না—ঘন ঘন স্নান করা ভারতীয় প্রথা, ইহা তোমাদের সমাজে প্রচলিত নয়।

আমি বহুবার জিজ্ঞাসিত হইয়াছিঃ 'তুমি এত হাস কেন ও এত ঠাট্টা বিদ্রূপ কর কেন?' মাঝে মাঝে আমি খুব গম্ভীর হই—যখন আমার খুব পেট-বেদনা হয়! ভগবান্ আনন্দময়। তিনি সকল অস্তিত্বের পিছনে। তিনিই সকল বস্তুর মঙ্গলময় সত্তাস্বরূপ। তোমরা তাঁহার অবতার। ইহাই তো গৌরবময়। যত তুমি তাঁহার সমীপবর্তী হইবে, তোমার শোক বা দুঃখজনক অবস্থা তত কম আসিবে। তাঁহার কাছ হইতে যত দূরে যাইবে ততই দুঃখে তোমার মুখ বিশুষ্ক হইবে। তাঁহাকে আমরা যত অধিক জানিতে পারি, তত ক্লেশ অন্তর্হিত

হয়। যদি ঈশ্বরময় হইয়াও কেহ শোকগ্রস্ত হয়, তবে সেইরূপ পরিস্থিতির প্রয়োজন কি? এইরূপ ঈশ্বরেরই বা প্রয়োজন কি? তাঁহাকে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও! আমরা তাঁহাকে চাই না।

কিন্তু ভগবান্ অনাদি নিরাকার সত্তা—ত্রিকালে অবাধিত সত্য, অব্যয়, শাশ্বত অভয়; আর তোমরা তাঁহার অবতার, তাঁহার রূপায়ণ। ইহাই বেদান্তের ঈশ্বর, আর তাঁহার স্বর্গ সর্বত্র অবস্থিত। যত ব্যষ্টি দেবতা আছেন, সব এই স্বর্গে বাস করেন, আর তোমরা সবও তো তাই। মন্দিরে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও প্রার্থনা দূর হউক।

কিসের জন্য প্রার্থনা কর? স্বর্গে যাইবার জন্য, কোন বস্তু লাভের আশায় আর অপর কেহ বঞ্চিত থাক্—এইজন্য। 'প্রভু, আমি আরও খাদ্য চাই! অপরে ক্ষুধার্ত থাক্!' ঈশ্বর—যিনি সত্যস্বরূপ, অনাদি, অনন্ত, সদা আনন্দময় সত্তা, যাহাতে কোন খণ্ড নাই, চ্যুতি নাই, যিনি সদামুক্ত, সদাপূত, সদাপূর্ণ—তাঁহার সম্বন্ধে কি ধারণা! আমরা আমাদের যত মানবীয় বৈশিষ্ট্য বৃত্তি ও সঙ্কীর্ণতা তাঁহাতে আরোপিত করিয়াছি। তাঁহাকে অবশ্যই আমাদের খাদ্য ও বসন যোগাইতে হইবে। বস্তুতঃ এই-সব আমাদের নিজেদের করিয়া লইতে হইবে আর কেহ কখনও এইগুলি আমাদের জন্য করিয়া দেয় নাই। এই তো সদা সত্য কথা।

কিন্তু তোমরা এই-বিষয়ে খুব কমই ভাব। তোমরা ভাব, এমন এক ভগবান্ আছেন তোমরা যাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র, যিনি তোমাদের প্রার্থনা মাত্রই তোমাদের জন্য কাজ করিয়া দেন; আর তোমরা তাঁহার নিকট সকল মানুষ সকল প্রাণীর জন্য করুণা প্রার্থনা কর না—কর কেবল নিজের জন্য, তোমার নিজস্ব পরিবারের জন্য, তোমাদের জাতির জন্য। যখন হিন্দুগণ খাইতে পায় না—তখন তোমরা গ্রাহ্যই কর না; সে-সময় তোমরা কল্পনাও কর না যে, খ্রীষ্টানদের যিনি ঈশ্বর, তিনি হিন্দুদেরও ঈশ্বর। আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা, আমাদের প্রার্থনা, আমাদের পূজা সবই অবিদ্যা-প্রভাবে আমাদের নিজেদের 'দেহ' ভাবনা করা-রূপ মূর্খতার দ্বারা বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছি। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা তোমাদের ভাল নাও লাগিতে পারে। আজ তোমরা আমাকে অভিশাপ দিতে পার, কিন্তু কাল তোমরা আমাকে অভিনন্দিত করিবে।

আমরা অবশ্যই চিন্তাশীল হইব। প্রত্যেক জন্মই বেদনাদায়ক। আমাদিগকে অবশ্যই জড়বাদ হইতে বাহিরে আসিতে হইবে। জগন্মাতা হয়তো আমাদের তাঁহার গণ্ডীর বাহিরে আসিতে দিবেন না; তাহা হউক আমরা নিশ্চিত চেষ্টা করিব। এই সংগ্রামই তো সকল প্রকারের পূজা; আর বাকী যাহা কিছু সব ছায়ামাত্র। তুমিই তো ব্যষ্টিদেবতা। এখনই আমি তোমার পূজা করিতেছি। এই তো সর্বোৎকৃষ্ট প্রার্থনা—সমগ্র জগতের পূজা করা অর্থাৎ এইভাবে জগতের সেবা করা। আমি জানি, ইহা একটি উচ্চ ভাবভূমিতে দাঁড়ান—ইহাকে ঠিক উপাসনার মত মনে হয় না; কিন্তু ইহাই সেবা, ইহাই পূজা।

অসীম জ্ঞান কর্মসাধ্য নয়। জ্ঞান সর্বকালে এইখানেই, অজর ও অজাত। তিনি, জগদীশ্বর জগতের প্রভু—সকলের মধ্যে বিরাজিত। এই শরীরই তাঁহার একমাত্র মন্দির। এই একটি মন্দিরই চিরকাল ছিল। এই আয়তনে—শরীরে তিনি অধিষ্ঠিত—তিনি আত্মারও আত্মা—রাজারও রাজা। আমরা এই কথা বুঝিতে পারি না, আমরা তাঁহার প্রস্তর-মূর্তি বা প্রতিমা গড়ি এবং তাহার উপর মন্দির নির্মাণ করি। ভারতে এই বেদান্ততত্ত্ব সর্বকালে আছে, কিন্তু ভারত এই-সব মন্দিরে পরিপূর্ণ। আবার কেবল মন্দিরই নয়—অনেক গুহা আছে, যাহার মধ্যে বহু খোদিত মূর্তি রহিয়াছে। 'মূর্খ গঙ্গার তীরে বাস করিয়া জলের নিমিত্ত কূপ খনন করে!' আমরা তো এইরূপই! ঈশ্বরের মধ্যে বাস করিয়াও আমরা প্রতিমা গড়ি। আমরা তাঁহাকে মূর্তিতে প্রতিফলিত দেখিতে চাই—যদিও সর্বদা তিনি আমাদের শরীরের মন্দিরেই অবস্থান করিতেছেন। আমরা সকলেই উন্মাদ—আর ইহাই বিরাট ভ্রম।

সব জিনিষকে ভগবান্ বলিয়া পূজা কর—প্রত্যেকটি আকৃতিই তাঁহার মন্দির। বাদ-বাকী সব প্রতারণা—ভ্রম। সর্বদা অন্তর্মুখী হও, কখনও বহির্মুখী হইও না। এইরূপ ঈশ্বরের কথাই বেদান্ত প্রচার করে—আর এই তাঁহার পূজা। স্বভাবতই বেদান্তে কোন সম্প্রদায়, ধর্ম বা জাতিবিচার নাই। কিভাবে এই ধর্ম ভারতের জাতীয় ধর্ম হইতে পারে?

শত শত জাতিবিভাগ! যদি কেহ অপরের খাদ্য স্পর্শ করে, তবে চীৎকার করিয়া উঠিবে—'প্রভু, আমাকে রক্ষা কর—আমি অপবিত্র হইলাম!' পাশ্চাত্য পরিদর্শন করিয়া আমি যখন

ভারতে ফিরিয়া গেলাম, তখন পাশ্চাত্যদের সহিত আমার মেলামেশা ও আমি যে গোঁড়ামির নিয়মাবলী ভঙ্গ করিয়াছি, ইহা লইয়া কয়েকজন প্রাচীনপন্থী খুব আন্দোলন করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যে আমার বেদের তত্ত্ব প্রচার করা তাঁহারা সমর্থন করিতে পারেন নাই।

আমরা যদি সকলেই আত্মস্বরূপ ও এক, তবে কেমন করিয়া ধনী দরিদ্রের প্রতি, বিজ্ঞ অজ্ঞের প্রতি মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া যাইতে পারে? বেদান্তের ভাবে পরিবর্তিত না হইলে ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা কি করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারে? অধিকসংখ্যক যথার্থ বিজ্ঞ লোক পাইতে সহস্র সহস্র বৎসর সময় লাগিবে। মানুষকে নূতন পথ দেখান—মহৎ ভাব দেওয়া খুবই কঠিন কাজ। পুরানো কুসংস্কারগুলি তাড়ান আরও কঠিন—খুবই কঠিন কাজ, সেগুলি সহজে লোপ পায় না। এত শিক্ষা সত্ত্বেও পণ্ডিতগণ অন্ধকার দেখিতে ভয় পান—শিশুকালের গল্পগুলি তাঁহাদের মনে আসিতে থাকে এবং তাঁহারা ভূত দেখেন।

‘বেদ’ , এই শব্দটির অর্থ জ্ঞান এবং ইহা হইতে ‘বেদান্ত’ শব্দটি আসিয়াছে। সব জ্ঞানই বেদ, ইহা অনন্ত ঈশ্বরের ন্যায় অনন্ত। জ্ঞান কেহই সৃষ্টি করিতে পারে না। তোমরা কি কখনও জ্ঞানকে সৃষ্টি হইতে দেখিয়াছ? ইহাকে আবিষ্কার করা যায়—যাহা আবৃত ছিল, তাহাকে অনাবৃত করা যায়। জ্ঞান সর্বদা এইখানেই অবস্থিত, কারণ জ্ঞানই স্বয়ং ঈশ্বর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের জ্ঞান—সবই আমাদের সকলের মধ্যেই রহিয়াছে। তাহাকে আমরা আবিষ্কার করি—এই পর্যন্ত। এই-সব জ্ঞানই সাক্ষাৎ ভগবান্। ‘বেদ’ এক মহদায়তন সংস্কৃত গ্রন্থ। আমাদের দেশে যিনি বেদপাঠ করেন, তাঁহার সম্মুখে আমরা নতজানু হই। আর যে ব্যক্তি পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছে, তাহাকে আমরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না। এটা কুসংস্কার—মোটেই বেদান্ত মত নয়—এও জঘন্য জড়বাদ। ঈশ্বরের নিকট সকল জ্ঞানই পবিত্র; জ্ঞানই ঈশ্বর। অনন্ত জ্ঞান পরিপূর্ণরূপে সকল মানুষের মধ্যেই নিহিত আছে। যদিও তোমাদিগকে অজ্ঞের ন্যায় দেখায়, কিন্তু তোমরা সত্য সত্যই অজ্ঞ নও। তোমরা ভগবানের শরীর—তোমরা সকলেই। তোমরা সর্বশক্তিমান্, সর্বত্র অবস্থিত,

দিব্যসত্তার অবতার। তোমরা আমাকে উপহাস করিতে পার, কিন্তু একদিন সময় আসিবে, যখন তোমরা ইহা বুঝিতে পারিবে, অবশ্যই বুঝিবে—কেহই বাকী থাকিবে না।

লক্ষ্য কি? যাহা আমি বলিয়াছি—বেদান্ত; ইহা কোন নূতন ধর্ম নয়। খুব পুরাতন—ঈশ্বরের মত পুরাতন। এই ধর্ম স্থান বা কালে সীমিত নয়—ইহা সর্বত্র বিরাজিত। এই সত্য সকলেই জানে। আমরা সকলেই এই সত্য অন্বেষণ করিতেছি। সমগ্র বিশ্বেরও ঐ একই গতি। ইহা এমন কি বহিঃপ্রকৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রত্যেকটি পরমাণু ঐ লক্ষ্যের দিকে প্রচণ্ডগতিতে ছুটিতেছে। আর তুমি কি মনে কর যে, অনন্ত শুদ্ধ এই জীবগণের কেহ পরম সত্য লাভ না করিয়া পড়িয়া থাকিবে? সকলেই পাইবে—সকলেই একই লক্ষ্যপানে অন্তর্নিহিত দেবত্বের আবিষ্কার করিতে চলিয়াছে। পাগল, খুনী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ—যে-মানুষ বিচারের প্রহসনে এ দেশে শাস্তি পায়, সকলেই একই সত্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কেবলমাত্র যাহা আমরা অজ্ঞানে করিতেছিলাম, তাহা সজ্ঞানে ও ভালভাবে করা আমাদের কর্তব্য।

সকল সত্তার ঐক্যবোধ তোমাদের সকলের মধ্যে পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। এ-পর্যন্ত কেহ উহা না লইয়া জন্মায় না। যতই তোমরা অস্বীকার কর না কেন, ঐ বোধ ক্রমাগত নিজেকে প্রকাশ করিতেছে। মানবীয় প্রেম কি? উহা কমবেশী এই ঐক্যবোধেরই স্বীকৃতি। ‘আমি তোমাদের সহিত এক—আমার স্ত্রী, আমার পুত্র ও কন্যা, আমার বন্ধু।’ কেবল তোমরা না জানিয়া এই ঐক্য সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে বলিতেছ, ‘কেহ পতির জন্য পতিকে কখনই ভালবাসে নাই, পতির অন্তরস্থ আত্মার জন্যই পতিকে ভালবাসিয়াছে।’ পত্নী এইখানেই ঐক্যের সন্ধান পাইয়াছেন। পত্নীর মধ্যে পতি নিজেকে দেখিতে পান—স্বভাবতই দেখিতে পান, কিন্তু তাহা তিনি জ্ঞানতঃ—সচেতনভাবে পান না। সমগ্র বিশ্বই একটি অস্তিত্বে গ্রথিত। এ-ছাড়া অন্য আর কিছুই হইতে পারে না। বিভিন্নতা হইতে আমরা সকলে একটি বিশ্বাস্তিত্বের দিকে চলিয়াছি। পরিবারগুলি গোষ্ঠীতে, গোষ্ঠীগুলি উপজাতিতে, উপজাতিগুলি জাতিতে, জাতিগুলি মানবত্বে, কত বিভিন্ন মত—একত্বের দিকে চলিয়াছে। এই একত্বের অনুভূতিই জ্ঞান—বিজ্ঞান।

ঐক্যই জ্ঞান—নানাই অজ্ঞান। এই জ্ঞানে তোমাদের জন্মগত অধিকার। তোমাদিগকে এই তত্ত্ব শিখাইতে হইবে না। বিভিন্ন ধর্ম এই জগতে কখনই ছিল না। আমরা মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করি বা না করি, মুক্তি আমরা লাভ করিবই—ইহা আমাদের নিয়তি। যেহেতু তোমরা মুক্তস্বভাব, এই অবস্থা তোমাদিগকে লাভ করিতেই হইবে এবং তোমরা মুক্ত হইয়া যাইবে। আমরা মুক্তই আছি, কেবল ইহা আমরা জানি না, আর আমরা এ পর্যন্ত কি করিতেছি, তাহাও আমরা জানি না। সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ে ও আদর্শে একই নীতিকথা বর্তমান; কেবল একটি কথাই প্রচারিত হইয়াছে—'নিঃস্বার্থ হও, অপরকে ভালবাস।' কেহ বলিতেছে, 'কারণ যিহোভা আদেশ করিয়াছেন।' 'আল্লাহ্'—মুসলিম বলিবেন। অপরে বলিবেন—'যীশু।' যদি ইহা কেবল যিহোভারই আদেশ, তবে যাহারা যিহোভাকে জানে না, তাহাদের নিকট ইহা কিভাবে আসিল? যদি যীশুই কেবল এই আদেশ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে যে-ব্যক্তি যীশুকে কখনও জানে না, সে কি করিয়া ইহা পাইল? যদি বিষ্ণুই কেবল এই আদেশ দিয়া থাকেন, তবে য়াহুদীগণ, যাহারা সেই ভদ্র-লোকের সঙ্গে কখনই পরিচিত নয়, কিভাবে তাহা পাইল? এই-সব হইতে মহত্তর আর একটি উৎস আছে। কোথায় সেইটি? তাহা ভগবানের সনাতন মন্দিরে—নিম্নতম হইতে উচ্চতম সকল প্রাণীর অন্তরাত্মায় এই তত্ত্ব নিহিত। সেই অনন্ত নিঃস্বার্থতা, সেই অনন্ত আত্মোৎসর্গ, ঐক্যের দিকে ফিরিবার সেই অনন্ত বাধ্যবাধকতা—এই সবই সেইখানে রহিয়াছে।

অবিদ্যার অজ্ঞানের জন্য আমরা খণ্ডিত, সীমিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছি, এবং আমরা তাই ক্ষুদ্র, শ্রীমতী অমুক ও শ্রীঅমুক হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু সমগ্র প্রকৃতি প্রতি পলকে এই ভ্রম—এই মিথ্যা প্রতীতি জন্মাইতেছে। আমি কখনও অন্য-সকল হইতে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র পুরুষ বা ক্ষুদ্র নারী নহি, আমি এই বিশ্বব্যাপী অস্তিত্ব। আত্মা প্রতি মুহূর্তে আপন মহিমায় উন্নীত হইতেছে ও ইহার অন্তর্নিহিত দেবত্ব ঘোষণা করিতেছে।

বেদান্ত সর্বত্রই বিদ্যমান, কেবল তোমাদিগকে সচেতন হইতে হইবে। পুঞ্জীকৃত অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কারগুলিই আমাদের অগ্রগতির বাধাস্বরূপ। যদি আমরা সক্ষম হই, তবে আইস, আমরা ঐ-সবগুলিকে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলি এবং ধারণা করিতে শিখি যে, ঈশ্বর

চেতনাস্বরূপ এবং তাঁহার পূজা জ্ঞান ও সত্যের মধ্য দিয়া করিতে হয়। জড়বাদী হইবার জন্য কখনও সচেষ্ট হইও না। সকল জড়কে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও। ঈশ্বরের কল্পনা অবশ্যই যথার্থ আধ্যাত্মিক হইবে। ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণাগুলি কমবেশী জড়বাদ-ঘেঁষা–এগুলিকে দূর করিতে হইবে। মানুষ যত বেশী আধ্যাত্মিক হইতে থাকে, তত সে এই সকল ভাব পরিত্যাগ করে ও এইগুলি পশ্চাতে ফেলিয়া আগাইয়া যায়। বস্তুতঃ সকল দেশেই এমন কয়েকজন লোক সর্বকালে আসিয়াছেন, যাহারা এই সব জড়বাদ ছুঁড়িয়া ফেলিবার শক্তি রাখেন এবং প্রখর দিবালোকে দণ্ডায়মান হইয়া জ্ঞানস্বরূপকে জ্ঞানের দ্বারাই উপাসনা করিয়া গিয়াছেন।

সবই এক আত্মা–বেদান্তের এই জ্ঞান যদি প্রচারিত হয়, তাহা হইলে সমগ্র মনুষ্যসমাজই অধ্যাত্মভাবে ভাবিত হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? আমি জানি না। সহস্র বৎসরেও তাহা হইবে না। পুরাতন সংস্কারগুলি সব দূরীভূত হইবে। তোমরা সকলেই পুরাতন সংস্কারগুলিকে কিভাবে চিরন্তন করা যায়, তাহাতেই উৎসাহিত। আবার পারিবারিক ভ্রাতৃত্ব, গোষ্ঠীগত ভ্রাতৃত্ব, জাতিগত সৌভ্রাত্র–এই সকল ভাবও বিদ্যমান। এই সকলই বেদান্ত উপলব্ধির বাধাস্বরূপ। ধর্ম অতি সামান্য কয়েকজনের নিকটই ঠিক ঠিক ধর্ম।

গোটা পৃথিবীতে ধর্মের ক্ষেত্রে যাঁহারা কর্ম করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক কর্মী। ইহাই মানুষের ইতিহাস। তাঁহারা কদাচিৎ সত্যের সহিত মিলাইয়া জীবন-ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা সর্বদাই সমাজ নামক ঈশ্বরের পূজক ছিলেন, তাঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনসাধারণের বিশ্বাস–তাহাদের কুসংস্কার, তাহাদের দুর্বলতাকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিতে আগ্রহশীল ছিলেন। তাঁহারা প্রকৃতিকে জয় করিতে চেষ্টা করেন নাই, নিজদিগকে প্রকৃতির অনুকূলে করিয়াছেন–ইহার বেশী কিছু নয়। ভারতে গিয়া নূতন ধর্মমত প্রচার কর–কেহ তোমার কথা শুনিবে না। কিন্তু যদি বল যে, বেদ হইতে ঐ মত প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহারা বলিবে–'ভাল কথা।' এখানে আমি এই মতবাদ প্রচার করিতে পারি, কিন্তু তোমরা–তোমাদের কয়জন আমার কথা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করিবে? কিন্তু সমগ্র সত্য এইখানেই বর্তমান এবং আমি তোমাদিগকে সত্য কথাই বলিব।

এই প্রশ্নের অপর একটি দিকও আছে। সকলেই বলেন, চরম বিশুদ্ধ সত্যের উপলব্ধি হঠাৎ আসিতে পারে না এবং পূজা প্রার্থনা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ধর্মীয় সাধনার পথে মানুষকে ধীরে ধীরে আগাইয়া যাইতে হইবে। এইটি ঠিক পথ কিনা, তাহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিব না। ভারতে আমি উভয় পথ ধরিয়াই কাজ করি।

কলিকাতায় আমাদের এই-সব প্রতিমা ও মন্দির রহিয়াছে—ঈশ্বরের ও বেদের নামে—বাইবেল এবং যীশু ও বুদ্ধের নামে। চেষ্টা চলুক। কিন্তু হিমালয়ের উপরে আমার একটি স্থান আছে, যেখানে বিশুদ্ধ সত্য ব্যতীত আর কিছুরই প্রবেশাধিকার থাকিবে না—এরূপ মনঃস্থ করিয়াছি। সেইখানে তোমাদিগকে আজ আমি যে-ভাবের কথা বলিলাম, তাহা কার্যে পরিণত করিতে চাই। একটি ইংরেজ-দম্পতি ঐ স্থানের দায়িত্বে রহিয়াছেন। উদ্দেশ্য—সত্যানুসন্ধিৎসুদের শিক্ষিত করা এবং বালক-বালিকাদিগকে ভয়হীন ও কুসংস্কারহীন ভাবে গড়িয়া তোলা। তাহারা যীশু, বুদ্ধ, শিব, বিষ্ণু—ইত্যাদি কাহারও বিষয় শুনিবে না। তাহারা প্রথম হইতেই নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখিবে। তাহারা বাল্যকাল হইতেই শিখিবে যে, ঈশ্বরই চেতনা এবং তাঁহার পূজা সত্য ও জ্ঞানের মধ্য দিয়া করিতে হয়। সকলকেই চেতনা-রূপে দেখিতে হয়—ইহাই আদর্শ। আমি জানি না, ইহাতে কি ফল হইবে। আজ আমার যেরূপ মনে হইতেছে, সেরূপ প্রচার করিতেছি। আমার মনে হইতেছে—যেন দ্বৈত সংস্কার বাদ দিয়াই আমি সম্পূর্ণ এইভাবেই শিক্ষিত হইয়াছিলাম। দ্বৈতবাদে যে কিছু ভাল হইতে পারে—তাহাতে যে আমি মাঝে-মাঝে সম্মতি জানাই, তাহার কারণ ইহা দুর্বল ব্যক্তিকে সাহায্য করে। যদি তোমাকে কেহ ধ্রুবতারা দেখাইয়া দিতে বলে, তবে প্রথমে তুমি তাহাকে ধ্রুবতারার নিকটবর্তী কোন উজ্জ্বল তারকা দেখাও, তারপর একটি অনতি-উজ্জ্বল তারকা, তারপর একটি ক্ষীণপ্রভ তারকা, পরিশেষে ধ্রুবতারা দেখাও। এই পদ্ধতিতে তাহার পক্ষে ধ্রুবতারা দেখা সহজ হয়। এই-সব বিভিন্ন উপাসনা ও সাধনা, বাইবেল-জাতীয় গ্রন্থ ও দেবতা সকল ধর্মের প্রাথমিক সোপান—ধর্মের কিণ্ডারগার্টেন মাত্র।

কিন্তু তারপর আমি ইহার অপর দিকটির কথা ভাবি। যদি এই মন্থর ও ক্রমিক পদ্ধতি অনুসরণ কর, তবে জগতের এই সত্যে পৌঁছাইতে কতদিন লাগিবে? কত দিন? আর ইহা যে প্রশংসনীয় রূপে সাফল্য লাভ করিবে, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? এই পর্যন্ত তাহা হয় নাই। দুর্বলদের পক্ষে ক্রমিক অথবা অক্রমিক, সহজ অথবা কঠিন, যাহাই হউক না কেন—দ্বৈতবাদ-সম্মত সাধন কি মিথ্যাভিত্তিক নয়? প্রচলিত ধর্মীয় সাধনগুলি মানুষকে দুর্বল করিতেছে, সুতরাং সেগুলি কি ভুল নয়? ঐগুলি ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত—মানুষের ভুল দৃষ্টিভঙ্গীর উপর। দুটি ভুল কি একটি সত্য সৃষ্টি করিতে পারে? মিথ্যা কি সত্য হয়? অন্ধকার কি আলোকে পরিণত হয়?

আমি একজন মহামানবের ক্রীতদাস—তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমি কেবল তাঁহার বার্তাবহ; আমি পরীক্ষা করিতে চাই। বেদান্তের যে সত্যগুলি তোমাদিগকে বলিলাম, তাহা লইয়া ইতঃপূর্বে কেহ সত্যিকারের গবেষণা করে নাই। যদিও বেদান্ত পৃথিবীর প্রাচীনতম দর্শন—ইহা সর্বদাই কুসংস্কার ও অন্যান্য জিনিষের সহিত মিশ্রিত হইয়া ছিল।

যীশু বলিয়াছিলেন, 'আমি ও আমার স্বর্গস্থ পিতা এক', এবং তোমরা তাহার পুনরাবৃত্তি কর। তথাপি ইহা মানবসমাজকে সাহায্য করে নাই। উনিশ শত বৎসর ধরিয়া মানুষ এই বাণী বোঝে নাই। তাহারা যীশুকে মানবের পরিত্রাতা করিয়াছে। তিনি ঈশ্বর, আর আমরা কীট! ঠিক এইরূপ ভারতবর্ষে—প্রত্যেক দেশে এই ধরনের বিশ্বাসই সম্প্রদায়বিশেষের মেরুদণ্ড।

হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে শেখানো হইয়াছে—জগৎপ্রভু, অবতার, পরিত্রাতা ও প্রেরিত পুরুষগণকে পূজা করিতে হইবে; শেখানো হইয়াছে—তাহারা নিজেরা অসহায় হতভাগ্য জীব, মুক্তির জন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে। এইরূপ বিশ্বাসে নিশ্চয় অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে পারে। তথাপি সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থায় এই প্রকার বিশ্বাস ধর্মের কিণ্ডারগার্টেন, এইগুলি মানুষকে অতি অল্পই সাহায্য করিয়াছে বা কিছুই করে নাই। মানুষ এখনও

অধঃপাতের গহ্বরে মোহাবিষ্ট হইয়াই পড়িয়া রহিয়াছে। অবশ্য কয়েকজন শক্তিশালী মানুষ এই মায়ার ভ্রম অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারেন।

সময় আসিতেছে—যখন মহান্ মানবগণ জাগিয়া উঠিবেন; এবং ধর্মের এই শিশুশিক্ষার পদ্ধতি ফেলিয়া দিয়া তাঁহারা আত্মার দ্বারা আত্মার উপাসনা-রূপ সত্যধর্মকে জীবন্ত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিবেন।